হেমেন্দ্রকুমার রায়

এবং

জগৎশেঠের রত্নকুম্ভ

ছবি · নারায়ণ দেবনাথ

সম্পাদনা

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়ন্ত-মানিক বনাম প্রতাপ চৌধুরির অভিযান

হেমেন্দ্রকুমার রায়

এবং
জগৎশেঠের রত্নকুঠী

(‘সোনার আনারস’ এবং ‘জগৎশেঠের রত্নকুঠী’)



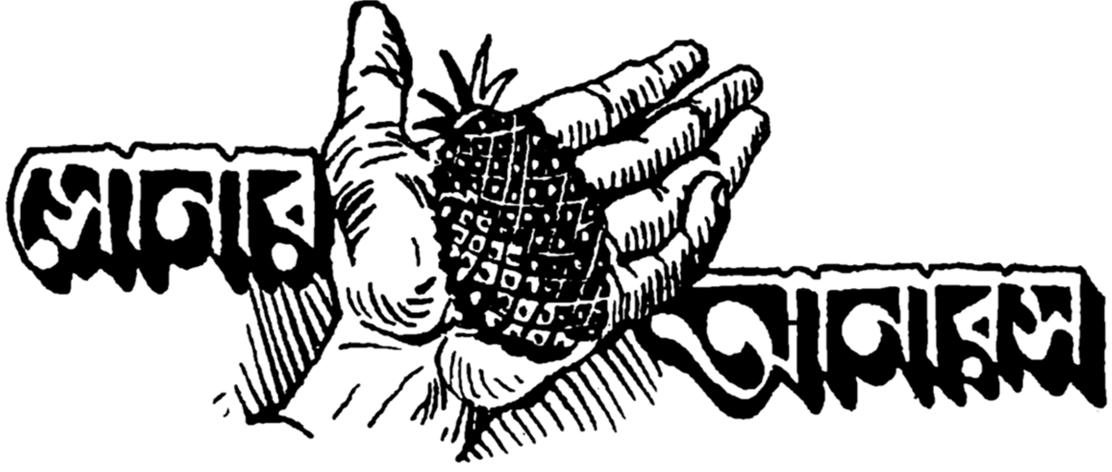
সম্পাদনা: ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং জগৎশেঠের রত্নকুম্ভ

হেমেন্দ্রকুমার রায়



সূচিপত্র



।। প্রথম অধ্যায় ।।

নূতন অভিযান

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, "আর পড়তে হবে না মানিক, ফেলে দাও তোমার ওই খবরের কাগজখানা! আমি রাজনীতির কচকচি শুনতে চাই না, আমি জানতে চাই নূতন নূতন অপরাধের খবর! কিন্তু আমি যা চাই, তোমার ওই খবরের কাগজে তা নেই। অপরাধীরা কি আজকাল ধর্মঘট করেছে? এ হল কী? এত বড়ো কলকাতা শহর, কিন্তু কেউই অপরাধের মতন অপরাধ করতে পারছে না!"

মানিক কাগজখানা মেঝের উপরে নিক্ষেপ করে হাসতে হাসতে বললে, "কারুর পৌষ মাস, কারুর সর্বনাশ! তুমি চাও অপরাধীদের, কিন্তু সাধু নাগরিকদের পক্ষে তারা কি দুঃস্বপ্ন-লোকের জীব নয়?"

জয়ন্ত বললে, "অপরাধ হচ্ছে বিচিত্র! সাধু মানুষদের চেয়ে বেশি আকর্ষণ করে অপরাধীরাই। মহাভারত পড়বার সময় তুমি কি অনুভব করোনি মানিক, যুধিষ্ঠিরের

চেয়ে দূর্যোধন আর দুঃশাসনের কথা জানবার জন্যেই আমাদের বেশি আগ্রহ হয়? মাইকেলের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ পড়ে দ্যাখো। তার মধ্যে রামের চেয়ে বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছে রাবণের চরিত্রই! আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবন হচ্ছে একেবারেই বেরঙা, কিন্তু রঙের পর রঙের খেলা দেখা যায় অপরাধীদের জীবনেই।”

মানিক সায় দিয়ে বললে, “তা যা বলেছ ভাই, একথা না মেনে উপায় নেই। কিন্তু কী আর করবে বলো, কলকাতা পুলিশের সুন্দরবাবুও তিন মাসের ছুটি নিয়ে বসে আছেন, তিনিও যে ‘হুম’ বলে কোনও নূতন মামলা নিয়ে আমাদের এখানে ছুটে আসবেন, তারও আশা নেই। অগত্যা আমাদের বাধ্য হয়েই বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে।”

ঠিক এমনি সময়ে মধু চাকর এসে খবর দিলে, একজন লোক নাকি জয়ন্তের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, “কী রকম লোক মধু?”

- “একটি ছোকরা বাবু। বয়স বোধ হয় বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। তাঁর মুখ দেখলে মনে হয় তিনি যেন ভারী ভয় পেয়েছেন।”

- “আচ্ছা মধু, বাবুটিকে এখানেই নিয়ে এসো।”

তার একটু পরেই সিঁড়ির উপরে দ্রুত পদশব্দ জাগিয়ে একটি লোক ব্যস্তভাবে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “জয়ন্তবাবু কোথায়? আমি এখনই জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই!”

- “আমারই নাম জয়ন্ত। আপনি বড়োই উত্তেজিত হয়েছেন দেখছি, ওই চেয়ারখানার উপরে গিয়ে একটু স্থির হয়ে বসুন।”

আগন্তক সামনের চেয়ারখানা টেনে ধপাস করে তার উপরে বসে পড়ে বললে, “উত্তেজিত না হয়ে কী করি বলুন দেখি! কাল রাত্রে আর একটু হলেই আমার প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হয়ে যাচ্ছিল যে!”

জয়ন্ত হাসিমুখে বললে, "তাহলে ঘটনাটা নিশ্চয়ই গুরুতর বটে! কিন্তু কী জানেন, শান্তভাবে না বললে কোনও ঘটনার ভিতর থেকেই আমরা সত্যকে আবিষ্কার করতে পারি না।"

আগন্তুক অল্পক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "জয়ন্তবাবু, এইবার আমার কথা বলতে পারি কি?"

- "বলুন। আপনার কথা শোনবার জন্যে আমাদেরও আগ্রহের অভাব নেই।"

- "আপনাদের তো আগ্রহের অভাব নেই, কিন্তু কাল আমার ঘাড়ে চেপেছিল মস্ত বড়ো এক কুগ্রহ! আজ যে বেঁচে আছি, সে হচ্ছে ভগবানের দয়া।"

- "বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কথা। অতএব বেঁচে যখন আছেন, তখন নির্ভয়ে আপনার সমস্ত ইতিহাস আমাদের কাছে বর্ণনা করতে পারেন। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা করি, "আপনার নামটি কী?"

- "সুব্রত সরকার।"

- "বেশ, এইবার আপনার কী বলবার আছে বলুন।"

সুব্রত বললে, "কাল রাত্রে মশাই, আমার বাড়িতে ভয়ঙ্কর এক কাণ্ড হয়ে গেছে! আমি এখনও বিবাহ করিনি, নিজের বাড়িতে একলাই থাকি। কাল রাত্রে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে হল অনেকগুলো হাত দিয়ে অন্ধকারে কারা যেন আমাকে চেপে ধরেছে! আমি বাধা দেবার চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারলুম না; কারণ চার-পাঁচখানা হাত দড়ি দিয়ে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললে, আমার মুখেও গুঁজে দিলে বিছানার চাদরের খানিকটা, আর চোখের উপরেও বাঁধলে একখানা কাপড়! সেই অবস্থাতেই অনুভব করলুম, 'সুইচ' টিপে কারা আলো জ্বাললে। তারপর শুনলুম, আমার লোহার সিন্দুক খোলার শব্দ! তার খানিক পরেই ঘরের আলো গেল আবার নিবে। কয়েকজনের পায়ের শব্দ বাইরে চলে গেল, তারপর আস্তে আস্তে আমার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল, তারপর আর কারুর কোনও সাড়াশব্দ পেলুম না বটে, কিন্তু আমাকে সেই অবস্থাতেই কানা আর বোবার মতন চুপ করে থাকতে হল। সকালবেলায় চাকর এসে আমাকে মুক্তিদান করলে।"



জয়ন্ত বললে, “আপনার ঘরের ভিতরে বাইরের লোক এল কেমন করে?”

- “দরজা দিয়ে মশাই, দরজা দিয়ে! আমার একটি বদ-অভ্যাস আছে, গ্রীষ্মকালে আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে পারি না।”

- “তারপর? বিছানা থেকে নেমে আপনি কী দেখলেন?”

- “দেখলুম, আমার লোহার সিন্দুক খোলা পড়ে রয়েছে। তার ভিতরে শ-পাঁচেক টাকার নোট আর কিছু গয়নাও ছিল, কিন্তু সেসব কিছুই চুরি যায়নি। চোরেরা নিয়ে গেছে কেবল একটি জিনিস, যা ছিল সোনার আনারসের মধ্যে।”

জয়ন্ত বিস্মিতকণ্ঠে বললে, “সোনার আনারস? সে আবার কী?”

মানিক বললে, “সোনার পাথরবাটির কথা শুনেছি, কিন্তু সোনার আনারসের কথা শুনলাম এই প্রথম !”

সুব্রত বললে, “তাহলে একটু গোড়ার কথা বলতে হয়। কোন খেয়ালে জানি না, আমার প্রপিতামহ পিতল দিয়ে গড়িয়েছিলেন এই আনারসটি। এই আনারসের উপরে সোনার কলাই করা ছিল বলে আমরা একে সোনার আনারস বলেই ডাকি। আমার প্রপিতামহ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে এই সোনার আনারসটি পিতামহের হাতে দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, ‘যদি কোনওদিন তোমার বিশেষ অর্থাভাব হয়, তাহলে এই আনারসের মধ্যেই পাবে অর্থের সন্ধান!’ আমার পিতামহও মৃত্যুকালে আমার বাবাকে ঠিক এই কথাই বলে গিয়েছিলেন। বাবাও যখন মৃত্যুন্মুখ, তখন তার মুখেও শুনেছিলুম এই কথাই। এই সোনার আনারসটি টানলে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আমার পূর্বপুরুষরা ধনী ছিলেন বটে, কিন্তু আমি ধনী নই, তাই সোনার আনারসের ভিতর থেকে অর্থের সন্ধান করতে গিয়ে পেয়েছিলুম খালি এক টুকরো কাগজ, আর সেই কাগজের উপর লেখা ছিল যে কথাগুলো, তা প্রলাপের নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।”

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, “কথাগুলো কী?”

সুব্রত একটু ভেবে বললে, “কাগজে লেখা ছিল একটি ছড়া, কিন্তু তার প্রথম আর শেষ দিকটার কথা ছাড়া আর কিছুই আমার মনে পড়ছে না।”

- “যেটুকু মনে পড়ছে, বলুন দেখি।”

সুব্রত বললে, “ছড়ার প্রথম দিকটায় আছে এই কথাগুলি-

‘আয়নাতে ওই মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোটকা জট।’

বলতে পারেন জয়ন্তবাবু, এর মধ্যে কোনও মানে খুঁজে পাওয়া যায় কি? বৃদ্ধ বট নাকি আয়নাতে তার মুখ দেখে গান ধরেছে! এমন কথা শুনলে কি হাসি পায় না?"

জয়ন্ত মাথা হেট করে ভাবতে ভাবতে বললে, "আমার একটুও হাসি পাচ্ছে না সুব্রতবাবু! ছড়ার শেষ-দিকটায় কী আছে?"

সুব্রত বললে, "শেষ-দিকটায় আছে-

'সেইখানেতে জলচারী
আলো-আঁধির যাওয়া-আসা,
সর্পনৃপের দর্প ভেঙে
বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা!'

হ্যাঁ জয়ন্তবাবু, এগুলো কি পাগলের প্রলাপ নয়?"

জয়ন্ত প্রায় পাঁচ মিনিটকাল স্তব্ধ ও স্থির হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে উঠে বসে বলল, "ছড়ার মাঝখানকার কোনও কথাই আপনার মনে নেই?"

- "এ-রকম একটা বাজে ছড়ার কথা মনে রাখবার কেউ কি চেষ্টা করে জয়ন্তবাবু? চোর ব্যাটারা কী নির্বোধ! তারা কিনা লোহার সিন্দুক খুলে কেবল এই ছড়ার কাগজখানা নিয়েই সরে পড়েছে!"

জয়ন্ত বললে, "চোরেরা বেশি নির্বোধ কি আপনি বেশি নির্বোধ, সেটা আমি এখনই বুঝতে পারছি না। কিন্তু ছড়ার কিছু কিছু অর্থ আমি-যেন আন্দাজ করতে পারছি।"

- "পারছেন নাকি? আমি তো কতবার ওই কাগজখানা পড়ে দেখেছি, কিন্তু অর্থ বা অনর্থ কিছুই আন্দাজ করতে পারিনি।"

জয়ন্ত বললে, "এখনও আপনি কিছুই আন্দাজ করতে পারেননি, এটা হচ্ছে আশ্চর্য কথা! আপনার বাড়িতে একদল চোর এল, তারা আপনার লোহার সিন্দুক খুলে মূল্যবান কিছুই নিয়ে গেল না, নিয়ে গেল কেবল এক টুকরো কাগজ, যার উপরে লেখা ছিল এই ছড়াটি, আর আপনার পূর্বপুরুষরা বলে গেছেন যার মধ্যে

পাবেন আপনি দুঃসময়ে অর্থের সন্ধান। ‘সর্প-নৃপের দর্প ভেঙে বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা।’ এটুকু পড়েও আপনার মনে কোনও সন্দেহের ইঙ্গিত জাগেনি?”

সুব্রত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, “কিছু না, কিছু না। সর্পনৃপই বা কী, আর তার সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পর্কই বা কী?”

জয়ন্ত গম্ভীরকণ্ঠে বললে, “একটি সম্পর্ক থাকতে পারে বইকী! মানিক, তুমি কিছু বুঝতে পারছ কি?”

মানিক বললে, “পাগল, ধাঁধা নিয়ে আমি কোনও কালেই মাথা ঘামাবার চেষ্টা করি না!”

জয়ন্ত মৃদু হাস্য করে বললে, “কিন্তু ওই চেষ্টাই হচ্ছে আমার জীবনের তপস্যা! চিরদিনই আমি ধাঁধার জবাব খুঁজতে চাই। যাক গে সে-কথা। সুব্রতবাবু, আপনাকে আমি দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করব।”

- “করুন।”

- “এই ছড়ার কথা আপনি আগে আর কারুর কাছে বলেছিলেন কি?”

- “তা বলেছিলুম বইকী! অনেক লোকের কাছেই ওই ছড়াটা দেখিয়েছিলুম। যে দেখেছে সেই-ই অবাক হয়ে গেছে, ওর মধ্যে কোনও মানেও খুঁজে পায়নি। যার মানে নেই, তার মধ্যে আবার মানে খুঁজে পাওয়া যায় কি জয়ন্তবাবু?”

জয়ন্ত সেই জিজ্ঞাসার কোনওই জবাব না দিয়ে বললে, “সুব্রতবাবু আপনি বললেন যে, আপনার পূর্বপুরুষরা নাকি ধনী ছিলেন। তারাও কি কলকাতাতেই বাস করতেন?”

- “না। আমাদের আদি বাস হচ্ছে দক্ষিণ বাংলার কোদালপুর গ্রামে। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন জমিদার। দেশে আজও আমার কিছু জমি-জমা আছে, আর তার ব্যবস্থা করতে এখনও আমি মাঝে মাঝে দেশে যাই বটে; কিন্তু নিজেকে আর জমিদার ভেবে আত্মগৌরব লাভ করতে পারি না।”

- “দেশে আপনাদের বসতবাড়ি আছে তো?”

- “আছে, এইমাত্র। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, চার-চারটে মহল, তার চারিধার ঘিরে মস্তবড়ো বাগান, কিন্তু সে-সমস্তই আজ পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে আর বন-জঙ্গলে,

বসতবাড়ির একটা মহলের কিছু কিছু সংস্কার করে খান-ছয়েক ঘর কোনওরকমে মানুষের উপযোগী করে নিয়েছি, যখন দেশে যাই, সেই ঘরগুলো ব্যবহার করি।"

- "আপনাদের দেশের বাগানে পুকুর আছে?"

- "নিশ্চয়ই আছে, প্রকাণ্ড পুকুর-কলকাতার গোলদিঘির চেয়ে প্রায় চার-গুণ বড়ো-"

- "আর সেই পুকুরের ধারে কোনও পুরানো বটগাছ আছে কি?"

- "ভারী আশ্চর্য তো, আপনি এমন প্রশ্ন করছেন কেন? হ্যাঁ মশাই, পুকুরের দক্ষিণ তীরে আছে একটা মস্ত বটগাছ, তার বয়স কত কেউ তা জানে না।"

- "আর সেই বটগাছের উপরে বাস করে বকের দল?"

সুব্রত বিপুল বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, "একথা আপনি জানলেন কেমন করে?"

- "পরে বলব। আপাতত আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিন।"

- "সেই বটগাছের উপরে চিরদিন ধরেই বাস করে আসছে বকের দল, ও-গাছটা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন তাদের নিজস্ব সম্পত্তি!"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ বসে রইল নীরবে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিজের রুপোর শামুকের ভিতর থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে বললে, "মানিক, জাগ্রত হও।"

- "ব্যাপার কী বন্ধু? খুব খুশি না হলে তুমি নস্য নাও না। কিন্তু খুশির কারণটি কী?"

- "আর আমরা অলস হয়ে বসে থাকব না। ওঠো, মধুকে পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধতে বলো। আজ থেকেই শুরু হবে আমাদের নতুন অভিযান!"

- "কিন্তু যাবে কোনদিকে?"

- "সুব্রতবাবুর দেশে, কোদালপুর গ্রামে।"

সুব্রত খানিকক্ষণ অবাক হয়ে বসে রইল। তারপর বিস্মিত স্বরে বললে, "ও জয়ন্তবাবু, ওই ছড়ার প্রলাপের ভিতর থেকে আপনি কোনও অর্থ খুঁজে পেয়েছেন নাকি?"

- "আপনার পূর্বপুরুষেরা বলে গেছেন, ছড়ার মধ্যে অর্থের সন্ধান পাওয়া যাবে। তাদের কথা মিথ্যা নয়। সত্য-সত্যই এই ছড়াটির ভিতরে আছে গভীর অর্থ। কিন্তু

দুঃখের বিষয়, আপনি সমস্ত ছড়াটার কথা আমাকে বলতে পারলেন না; তাহলে হয়তো এখনই সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত।"

- "এমন জানলে আমি যে ছড়াটা একেবারে মুখস্থ করে রাখতাম।"

- "যাক গে, যেটুকু সূত্র পেয়েছি, তাই নিয়েই এখন কাজ আরম্ভ করে দি। মানিক, সুন্দরবাবুকে আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ করে এসো-তিনি এখন ছুটিতে আছেন। সুন্দরবাবু সঙ্গে না থাকলে আমাদের কোনও অভিযানই ভালো করে জমে না!"

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

ভূষোপাগলা

জয়ন্তরা কোদালপুর গ্রামে গিয়ে দেখলে, সুব্রত কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেনি। তাদের পৈতৃক অট্টালিকাখানি কেবল প্রকাণ্ড বললেই যথার্থ বলা হয় না, অত বড়ো অট্টালিকা রাজধানী কলকাতাতেও বোধ হয় দু-চারখানার বেশি নেই। আর সেই অট্টালিকার চারিপাশ ঘিরে বিরাজ করছে যে উদ্যান, তার সীমানা নির্দেশ করাও হচ্ছে রীতিমতো কঠিন ব্যাপার।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা এবং এক সময়ে যে তার সৌন্দর্যও ছিল অপূর্ব, সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু তার বর্তমান রূপ দেখলে মন হা-হা করে ওঠে। অট্টালিকার কোনও কোনও অংশ ধ্বসে পড়ে রচনা করেছে পাহাড়ের মতন স্তূপ। এবং তার কোনও কোনও অংশ কোনওক্রমে এখনও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে দাড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের বর্ণহীন, বালুকাহীন ও গঠনহীন বড়ো বড়ো ফাটল-ধরা গায়ের উপরে বিরাজ করছে রীতিমতো বন-জঙ্গল। মস্ত্র মস্ত অশথ, বট ও নিমগাছের দল প্রায় তাদের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে আছে, আর সেই সব গাছের ডালে ডালে বাদুড়, প্যাঁচা ও আরও নানা-জাতীয় পাখিরা এসে বাসা বেঁধেছে। এবং সেইসব গাছের তলদেশ জুড়ে আছে নানা-শ্রেণীর আগাছার ঝোপ-বাপ।

অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্ববর্তী বহুদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জমি, আগে যার নাম ছিল উদ্যান, এখন তারও অবস্থা ভয়াবহ বললেও চলে। আজ কেউ তাকে কল্পনাতেও উদ্যান বলে সন্দেহ করতে পারবে না, কারণ, তার নানা স্থানেই আশ্রয় নিয়েছে এমন গভীর জঙ্গল, যা দেখলে মহা অরণ্য 'সুন্দরবন'-এর কথাই মনে পড়ে। এক সময়ে যখন এখানে ছিল ফুলবাগান আর ফলবাগান, তখন যে চারিদিকেই ছিল উচ্চ ও কঠিন প্রাচীর, নানা জায়গায় আজও তার চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আজ প্রাচীরের অধিকাংশই ভেঙ্গেচুরে একেবারে হয়েছে ভূমিসাৎ।

সুন্দরবাবু রীতিমতো ভীতকণ্ঠে বললেন, "হুম! জয়ন্ত, তুমি কী বলতে চাও, গভীর অরণ্যের মধ্যে এই বিপুল ভগ্নস্তুপের ভিতরেই এখন কিছুকাল ধরে আমাদের বাস করতে হবে? উঁহু, উঁহু, কিছুতেই আমি এখানে থাকব না, কিছুতেই কেউ আমাকে এখানে থাকতে রাজি করাতে পারবে না। যত সব পাগলার পাল্লায় এসে পড়েছি! বাবাঃ, বেড়াতে এসে শেষে কি পৈতৃক প্রাণটিকে নষ্ট করব? এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বিষধর সর্প যে আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই! তার উপরে এখানে যে বাঘ-ভালুক জাতীয় বদ-মেজাজি জানোয়াররা নেই, এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। আমি আজই এখান থেকে সবেগে পলায়ন করতে চাই ।"

সুব্রত বললে, "মাভৈঃ সুন্দরবাবু, মাভৈঃ। এই ভাঙা অট্টালিকার মধ্যে এমন একটা অংশ আছে, যা ছোট্ট হলেও একেবারে আধুনিক বলেই মনে হবে। যে কয়দিন আমরা এখানে থাকব, সেই অংশটাই হবে আমাদের বাসস্থান।"

জয়ন্ত অধীর কণ্ঠে বললে, "সুব্রতবাবু, এসব বাজে কথা এখন ছেড়ে দিন। আপনি যে বড়ো পুষ্করিণীর কথা বলেছিলেন, আমি আগে সেইখানেই যেতে চাই।"

সুবত অগ্রসর হয়ে বললে, "আসুন আপনারা, আমি এখন সেই দিকেই যাত্রা করছি।"

বহু আগাছার ঝোপ এবং লতাপাতার জাল দিয়ে ঘেরা বনস্পতির মতন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের "জনতা" ভেদ করে মিনিট-পাঁচেক ধরে অগ্রসর হয়ে খানিকটা খোলা জায়গার উপরে এসে পড়ল তারা। সেখানেও ঝোপ-ঝাপ আছে বটে, কিন্তু বড়ো গাছের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তারই মাঝখানে দেখা গেল যেন ঘাসের সবুজ-মাখা একটা সমতল জমি।

মানিক বললে, "সুব্রতবাবু, আপনাদের বাগানের ভিতরে এত বড়ো একটা সবুজ মাঠ কেন?"

সুব্রত হেসে বললে, "ওটা মাঠ নয় মানিকবাবু, ওইটে হচ্ছে আমাদের বাগানের প্রধান পুষ্করিণী। ওর অধিকাংশই ভরে গিয়েছে পানায় আর পানায়, তাই ওকে দেখাচ্ছে সবুজ মাঠের মতন! ওখানে লাফ দিয়ে পড়লে মোটেই মাটি খুঁজে পাবেন না, তলিয়ে যাবেন একেবারে অতল তলে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম। এত বড়ো পুকুর আমি কলকাতাতেও দেখিনি! এ কি পুকুর, এ যে সমুদ্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ! উঃ! সুব্রতবাবুর পূর্বপুরুষরা কী ধনীই ছিলেন!"

এইরকম সব কথা বলতে বলতে সকলে সেই সরোবরের ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

মানিক বললে, "দেখছি, পুকুরের ওই ভাঙাঘাটের কাছে পানার অত্যাচার নেই।"

সুব্রত বললে, "বাগানের পাঁচিলের বেশির ভাগই ভেঙে গিয়েছে, গ্রামের লোকজনরা তাই অবাধে এইখানে এসে ওই পুকুরের জল ব্যবহার করে। একটি নয় মানিকবাবু, এই পুকুরের চারিদিকে এখনও আটটি ঘাট বর্তমান আছে। সব ঘাটেরই অবস্থা শোচনীয়, তবু দারুণ গ্রীষ্মের সময় যখন এখানকার সব পুকুরই জলশূন্য হয়ে যায়, তখন গাঁয়ের লোকেরা এসে এই পুকুরেরই জল ব্যবহার করে, কারণ, আমাদের এই পুষ্করিণী এত গভীর যে, এখানে কোনদিনই জলের অভাব হয় না।"

জয়ন্ত বললে, "এটা তো দেখছি পুকুরের উত্তরদিক। সুব্রতবাবু আপনি বলেছেন, এই পুকুরের দক্ষিণ তীরে আছে একটা সেকেলে বটগাছ। আমি এখন সেই গাছটার কাছেই যেতে চাই।"

সুব্রত বললে, "তাহলে আসুন আমার সঙ্গে।"

সরোবরের পূর্ব তীর দিয়ে সকলে বেশ খানিকক্ষণ ধরে অগ্রসর হল। তারপর পাওয়া গেল সরোবরের দক্ষিণ প্রান্ত।

সুব্রত অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললে, "ভাঙাঘাট আর পুকুরের জলের উপরে ছায়া ফেলে দাড়িয়ে আছে ওই সেই বুড়ো বটগাছ! জয়ন্তবাবু, দেখুন, এর ভিতর থেকে আপনি কোনও রহস্যের চাবি আবিষ্কার করতে পারেন কি না!"

জয়ন্ত সেই বটগাছটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললে, "এ বটগাছটা দেখছি শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন-এর বিখ্যাত বটগাছটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে! এর চারদিক দিয়ে যেসব ঝুরি মাটির উপরে এসে নেমেছে, তার প্রত্যেকটাই তো হচ্ছে এক একটা গাছের গুঁড়ির মতন।"

সুব্রত বললে, "শুনতে পাচ্ছেন কি, ওই বটগাছের ভিতর থেকে জেগে উঠছে কত চিৎকার? ও চিৎকার হচ্ছে বক আর তাদের বাচ্চাদের। দিনে-রাতে এই অশ্রান্ত চিৎকার কখনও থামে না। তাই গাঁয়ের লোকেরা এই গাছটাকে বটগাছ না বলে 'বকগাছ' বলে ডাকে।"

হঠাৎ শোনা গেল, চিৎকার করে কে যেন একটা কবিতা আবৃত্তি করছে!

জয়ন্ত সচমকে বললে, "কথাগুলো যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে দেখতে হল!"

তারপরেই শোনা গেল চেঁচিয়ে কে বলছে-

'আয়নাতে ওই মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোটকা জট।'

মানিক সবিস্ময়ে বললে, "এযে সোনার আনারসের ভিতরে পাওয়া সেই ছড়াটারই গোড়ার দিক।"

জয়ন্ত বললে, "চুপ! ছড়ার পরের অংশ শোনো।"

শোনা গেল-

'পশ্চিমাতে পঞ্চ পোয়া,
সূয্যিমামার ঝিকিমিকি,
নায়ের পরে যায় কত না,
খেলছে জলগ টিকটিকি।'

এই পর্যন্ত বলেই কণ্ঠস্বর আবার হল স্তব্ধ।

জয়ন্ত সহাস্যে বলে উঠল, "এ যে দেখছি ছড়ার দ্বিতীয় শ্লোক!"

সুব্রত বললে, "হ্যা জয়ন্তবাবু, ছড়াটা আমার মুখস্থ নেই বটে, কিন্তু এখন শুনে বেশ বুঝতে পারছি এটা তার দ্বিতীয় শ্লোকই বটে!"

জয়ন্ত আবার বললে, "চুপ! শোনো!"

অজানা কণ্ঠস্বরে আবার শোনা গেল-

'অগ্নিকোণে নেইকো আগুন,
-কাঙাল যদি মানিক মাগে,
গহন বনে কাটিয়ে দেবে
রাত্রি-দিবার অষ্টভাগে!'

কণ্ঠস্বর আবার স্তব্ধ হল।

সুব্রত হাসতে হাসতে বললে, "ও ছড়াটা কে বলছে জানেন? ও হচ্ছে এই গাঁয়েরই একটি লোক। ওর নাম হচ্ছে ভূষণ। এখানকার লোক ওকে ভূষোপাগলা বলে ডাকে! শুনেছি ওর বাবা ছিলেন আমাদের নায়েব। কিন্তু সোনার আনারসের ওই ছড়াটা কী করে যে ওর কণ্ঠস্থ হল সে-রহস্য আমি জানি না। তবে মাঝে মাঝে যখনই এখানে এসেছি, তখনই ওর মুখে শুনতে পেয়েছি ওই ছড়ার পঙ্‌তিগুলি। লোকে বলে, ওই ছড়া মুখস্থ করতে করতেই ও পাগল হয়ে গিয়েছে!"

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে , "কিন্তু আপনাদের ওই ভূষোপাগলা থেমে গেল কেন? আমার মনে হচ্ছে ওই ছড়াটার নতুন কোনও অংশ ওর মুখেই আমরা শুনতে পেতে পারি।"

ঠিক সেই সময়ে পুষ্করিণীর দক্ষিণ তীরের ঘাটের উপরে দাঁড়িয়ে উঠল একটি মূর্তি! তার একেবারে শীর্ণ দেহ, মাথার চুলে জট বেঁধেছে, মুখে রাশীকৃত দাড়ি-গোঁফ এবং সর্বাঙ্গ প্রায় অনাবৃত, কেবল কটিদেশে একখণ্ড কৌপীনের মতন বস্ত্র তার লজ্জা রক্ষার চেষ্টা করছে।

ভূষণ উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে জয়ন্তদের দিকে তাকিয়ে রইল।

পায়ে পায়ে তার কাছে এগিয়ে সুব্রত শুধোলে, "কী গো ভূষোপাগলা, এই দুপুরের রোদে ঘাটে বসে তুমি কি করছ?"



ভূষণ মাটির দিকে মুখ নামিয়ে যেন আপন মনেই বললে, "কিছুই করছি না, কিছুই করছি না, অনেক কিছুই করবার আছে, কিন্তু কিছুই করতে পারছি না।"

- "করতে পারছ না কেন?"

- "করতে পারছি না কেন, করতে পারছি না কেন? ছড়ার সঙ্গে পৃথিবী মিলছে না।"

- "মিলছে না কেন?"

- “যে পৃথিবীতে সোনার আনারস ফলে, মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে কোনওদিনই তার মিল হয় না। সোনার আনারস, সোনার আনারস হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।”

- “তুমি ও ছড়াটা শিখলে কোথায়?”

- “বাবা শিখিয়েছেন গো, বাবা শিখিয়েছেন-বাপ ছাড়া ছেলেকে আর কে শেখাবে বলো?”

জয়ন্ত বললে, “কিন্তু ছড়ার সবটা তো তুমি এখনও আমাদের শোনালে না?”

ভূষণ সে-কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল-_তার মুখে চোখে ফুটল রীতিমতো ভয়-ভয় ভাব! তারপর চারিদিকে ব্যস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল!

সুব্রত বললে, “হঠাৎ কী হল ভূষোপাগলা, চারিদিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন?”

সুব্রতের কথা সে শুনতে পেলে বলে মনে হল না। বিড়বিড় করে কী বকতে লাগল তাও বোঝা গেল না।

সুব্রত এগিয়ে গিয়ে তার একখানা হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে, “কী তুমি বিড়বিড় করছ? আমাদের কথার জবাব দাও!”

ভূষণ একেবারে বোবা হয়ে গেল। ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে সে তাকিয়ে রইল এক দিকে ।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে জয়ন্তও ফিরে দেখতে পেলে অল্প দূরেই রয়েছে একটা বড়ো ঝোপ।

কিন্তু সে ঝোপটা একেবারেই স্থির। সেখানে সন্দেহজনক কিছুই নেই।

হঠাৎ ভূষণ বলে উঠল, “দুশমন, দুশমন!”

সুব্রত বললে, “দুশমন আবার কে?”

- “আমি দুশমনদের গন্ধ পাচ্ছি!”

- “কোথায়?”

- “এই বাগানে।”

- “বাগানে খালি তো আমরাই আছি!”

- “যেখানে ভগবান, সেইখানেই থাকে শয়তান।”

- “কী পাগলামি করছ!”

ভূষণ গান ধরলে-

"আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা,
আমি তাদের পাগলা ছেলে-"

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, "ভূষণ, ও-গান থামিয়ে তুমি সেই ছড়ার সবটা আমাদের শুনিয়ে দাও।"

- "সোনার আনারসের ছড়া?"

- "হ্যা।"

- "সে ছড়া তো তোমাদের শোনাতে পারব না!"

- "কেন বলো দেখি?"

- "তোমরা শুনলে দুশমনরাও শুনতে পাবে।"

- "দুশমন এখানে নেই।"

- "আছে গো, আছে গো, আছে। আজকাল রোজই এখানে দুশমনদের গন্ধ পাই!"

- "তারা কারা?"

- "জানি না। তারা থাকে দূরে দূরে আর আনাচে-কানাচে মারে উঁকিঝুঁকি!"

- "তুমি ভুল দেখেছ!"

- "না গো, না গো, না! আমার চোখ ভুল দেখে না।"

- "বেশ তো, তুমি চুপি চুপি ছড়াটা আমাদের শোনাও না। তাহলে দূর থেকে দুশমনরা কিছুই শুনতে পাবে না।"

- "তোমরা দুশমন নও। ছড়াটা তোমাদের শোনাতে পারি।"

- "বেশ, তবে শোনাও।"

ভূষণ শুরু করলে-

'আয়নাতে ওই মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট-'

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ থেমে পড়ে ত্রস্ত চক্ষে আবার সেই ঝোপটার দিকে তাকালে।

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তেরও দৃষ্টি ফিরল সেই দিকে। তার দেখাদেখি আর সকলেও ফিরে দাঁড়াল।

মুহূর্ত-দুই পরে দেখা গেল, খানিকটা ধোঁয়া ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে!

প্রায় আধ মিনিট পরে আবার সেই দৃশ্য।

ভূষণ বলে উঠল, "দুশমন!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম, ঝোপের ভিতর বসে নিশ্চয় কেউ বিড়ি কী সিগারেট খাচ্ছে!"

ভূষণ আবার বললে, "দুশমন!"

জয়ন্ত বললে, "এগিয়ে দেখতে হল।"

জয়ন্তের পিছনে পিছনে আর সকলেও অগ্রসর হল-কেবল ভূষণ ছাড়া। সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে নিজের মনে বিড়বিড় করে কী বকতে লাগল।

মিনিট-খানেকের মধ্যেই সকলে গিয়ে হাজির হল ঝোপের কাঁছে। বিড়ি বা সিগারেটের ধোঁয়া তখন অদৃশ্য। ঝোপটা বেশ বড়ো, তার ভিতরে অনায়াসেই দশ-বারো জন লোকের ঠাঁই হতে পারে।

কিন্তু ঝোপের ভিতরে পাওয়া গেল না জনপ্রাণীকে। তবে পাওয়া গেল একটা প্রমাণ। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ!

জয়ন্ত হেট হয়ে জমির উপর থেকে কী তুলে নিয়ে সকলকে দেখালে। সেটা হচ্ছে একটা জ্বলন্ত সিগারেটের অর্ধাংশ।

মানিক বললে, "তাহলে এখানে বসে নিশ্চয়ই কেউ ধূমপান করছিল এখন আমাদের আসতে দেখে সিগারেট ফেলে লম্বা দিয়েছে।"

জয়ন্ত বললে, "এটা কী সিগারেট দেখছ?"

- "হুঁ। স্টেট এক্সপ্রেস ৯৯৯।"

- "যে এ-রকম দামি সিগারেট ব্যবহার করে, তার ধনবান হওয়াই উচিত। ঝোপের ভিতর সিগারেটের গন্ধ ছাড়া আর একটা গন্ধও পাচ্ছি। এসেন্সের মিষ্টি গন্ধে এখানকার বাতাস এখনও ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি এতক্ষণ লুকিয়েছিল, সে কেবল ধনবান নয়, রীতিমতো শৌখিনও।"

সুন্দরবাবু বললেন, "এই ঝোপটার ফাঁক দিয়েই দেখতে পাচ্ছি, ওদিকে বিশ-পঁচিশ হাত তফাতে আরও একটা বড়ো ঝোপ রয়েছে। সেই শৌখিন ধনবান ব্যাটা এখান থেকে পালিয়ে ওইখানে গিয়ে লুকিয়ে নেই তো?"

জয়ন্ত বললে, "এখনই সে সন্দেহভঞ্জন করা যেতে পারে। চলুন।"

ঠিক সেই সময়ে আচম্বিতে পুষ্করিণীর দিক থেকে একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে এল।

তারপরেই চারিদিক আবার স্তব্ধ।

জয়ন্ত এক লাফ মেরে ঝোপের ভিতর থেকে বাইরে গিয়ে পড়ল।

তারপর চটপট চারিদিকে বুলিয়ে নিল নিজের খরদৃষ্টি। কিন্তু কোনও দিকেই কারুকে দেখতে পেলে না।

তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে মানিক বললে, "কই, কেউ তো কোথাও নেই। তবে আর্তনাদ করলে কে?"

- "আমার বিশ্বাস আর্তনাদ করেছে ভূষোপাগলা।"

- "কিন্তু সে পাগলাই বা কোথায়? তারও যে টিকি দেখতে পাচ্ছিনা।"

- "এসো, আর একবার ঘাটের কাছে যাওয়া যাক।"

সুন্দরবাবু জয়ন্তের পিছনে পিছনে অগ্রসর হতে হতে বললেন, "এ কী রকম ম্যাজিক বাবা? ঝোপের মাথায় সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ে, কিন্তু ঝোপের ভিতরে মানুষ নেই। পুকুরের ধারে আর্তনাদ জাগে, কিন্তু কারুকে দেখতে পাওয়া যায় না। এসব তো ভালো কথা নয়।"

কিন্তু পুকুরের ধারে গিয়েও আর্তনাদের বা ভূষণের অদৃশ্য হওয়ার কোনও কারণই খুঁজে পাওয়া গেল না। জয়ন্ত পুকুরের ঘাটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, "ঘাটের ধাপে ওটা কী পড়ে রয়েছে?"

মানিক এগিয়ে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে বললে, "এ যে দেখছি বাঁশের বাঁশি?"

সুব্রত বললে, "ও হচ্ছে ভূষোপাগলার বাঁশি! সে বাঁশি বাজাতে ভারী ভালোবাসে, আর ও-বাঁশিটিকে কখনও কাছছাড়া করে না।"

জয়ন্ত বললে, "যখন অমন প্রিয় বাঁশিকে সে পুকুর ঘাটে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হয়েছে, তখন বুঝতে হবে নিশ্চয় এখানে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে।"

- "দুর্ঘটনা!"

- "হ্যাঁ। ভূষোপাগলা হয় ভয়াবহ কিছু দেখে দারুণ আতঙ্কে আর্তনাদ করে বাঁশি ফেলেই বেগে পলায়ন করেছে, নয় কেউ বা কারা তাকে বন্দি করে এখান থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কোনও অর্থই বোঝা যাচ্ছে না। এখানে ভয়াবহ কিছুই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আর ভূষণের মতন একটা পাগলাকে বন্দি করে কার কী লাভ হতে পারে?"

জয়ন্ত কেবল বললে, "বোধ হয় শীঘ্রই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব।"

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

তির এবং ধোঁয়া

সুব্রত মিথ্যা বলেনি। সেই মস্ত ভাঙা অট্টালিকার একটা মহলকে মেরামত করে সত্যই সে আবার তার পূর্বশ্রী উদ্ধার করেছে। এ অংশটা যেন আলাদা একখানা বাড়ি।

উপরে-নীচে খান ছয়েক বড়ো বড়ো ঘর এবং উপরে-নীচে উঠানের চারিপাশেই আছে বেশ চওড়া দালান। কোথাও অযত্ন বা মালিন্যের চিহ্নমাত্র নেই।

বৈঠকখানা-ঘরটির মধ্যে আসবাবের সংখ্যাধিক্য নেই বটে, কিন্তু তার সাজসজ্জার ভিতরে পরিচয় পাওয়া যায় সুরুচির। এক দিকে আছে দুখানি কোচ ও একখানি সোফা এবং আর-এক দিকে ধবধবে চাদর-পাতা চৌকি, তার উপরে কয়েকটি মোটা-সোটা, শুভ্র ও কোমল তাকিয়া যেন অতিথিদের আহ্বান করছে সাদর মৌন ভাষায়।

ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি মার্বেল বাঁধানো গোল টেবিল এবং তার চারিপাশে ঘিরে রয়েছে খান-ছয়েক গদিমোড়া চেয়ার। টেবিলের উপর রাখা হয়েছে একটি নীলবর্ণপ্রধান চিনামাটির ফুলদানিতে কয়েকটি রক্ত-গোলাপ এবং ধূম্রসেবকদের ব্যবহারের জন্যে দুটি কাচের ছাইদান।

দেওয়ালকে অলঙ্কৃত করছে প্রাচ্য চিত্রকলা-পদ্ধতিতে আঁকা আটখানি ছবি। এখানে বিদ্যুৎবাতি নেই বটে, কিন্তু ছাদ থেকে ঝুলছে পেট্রলের এমন একটি বড়ো লণ্ঠন, যা প্রচুর আলোক বিতরণ করে অন্ধকারকে তাড়িয়ে দিতে পারে অনায়াসেই।

ঘরের তিন দিকের জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের পানে তাকালেও এখানকার যা প্রধান বিশেষত্ব, সেই বন-জঙ্গল, ঝোপ-ঝাপ বা আগাছাদের ভিড় চোখে পড়ে না। দেখা যায় শুধু ঘাসের সবুজ মখমলে মোড়া পরিষ্কার সমতল জমি এবং এখানে-ওখানে ছোটো বড়ো ফুলগাছদের বর্ণ বৈচিত্র্য।

সুন্দরবাবু ধপাস করে একখানা কোচের উপরে বসে পড়ে বললেন, "হুম! এতক্ষণে মনে হচ্ছে, আফ্রিকার নিবিড় অরণ্য ত্যাগ করে আমরা আবার সভ্যজগতে ফিরে এলুম। দিব্যি ঘরখানি! চোখ জুড়িয়ে যায়!"

মানিক বললে, "সুব্রতবাবু জঙ্গল সাফ করে বাড়ির এই অংশটিকে এমন উপভোগ্য করে তুলতে আপনার তো কম খরচ হয়নি। প্রবাদের কথাই সত্যি-মরা হাতিরও দাম লাখ টাকা!"

সুব্রত একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললে, "পৈতৃক ভিটের মায়া ছাড়া বড়োই কঠিন। আমি একেলে বাঙালিবাবুদের মতন নই মানিকবাবু। কত যুগ ধরে যেখানকার আকাশে-বাতাসে আমার পূর্বপুরুষদের পবিত্র স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, কেমন করে ভুলব সেখানকার মাটির প্রেমকে? তেমন সামর্থ্য থাকলে সমস্ত অট্টালিকা আর উদ্যানের নষ্ট-শ্রী আবার আমি উদ্ধার করতুম, কিন্তু উপায় নেই-উপায় নেই। অট্টালিকার ওই একটি অংশকেই বাসোপযোগী করে তুলতে গিয়ে মহাজনের কাছে আমাকে ঋণ স্বীকার করতে হয়েছে।"

জয়ন্ত বললে, "সুব্রতবাবু, আপনার উপরে আমার শ্রদ্ধা বাড়ল। যারা নিজেদের বংশগৌরব আর অতীত মহিমা ভুলে যায়, তারা মানুষ নামের যোগ্য নয়। অথচ বাংলাদেশের যে দিকে তাকাই সেদিকেই , দেখতে পাই এমনি অমানুষের দল। তারা আজ নিজেদের গ্রাম ভুলে নব্য আর শহুরে হওয়ার জন্যে কলকাতায় এসে সিনেমা, থিয়েটার, ফুটবল-ক্রিকেট আর হোটেল-রেস্তোরাঁ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছে। মুখময় তাদের 'স্নো' আর 'পাউডারের' প্রলেপ, চোখে তাদের রোদচশমা, ওষ্ঠাধরে সিগারেট,

হাতে ‘রিস্টওয়াচ’ আর নট-নটীদের ছবি, পরনে ফিরিঙ্গি পোশাক আর পায়ে মেয়েলি চলনের ভঙ্গি। অথচ তাদের অবহেলায় তাদের
গ্রাম যে অরণ্যের নামান্তর হতে বসেছে, সেদিকে কারুরই খেয়াল-এমনকী খেয়াল করবার ইচ্ছা পর্যন্ত নেই। আমি এদের কীটপতঙ্গ বলে মনে করি-এরা কেবল নরাধম নয়, পশুরও অধম! আপনি যে এজাতীয় জীব নন, আপনার মধ্যে যে যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে, তারই প্রমাণ পেয়ে আমি আজ অত্যন্ত আনন্দিত হলুম।...কিন্তু যাক সে কথা এখন কাজের কথা হোক। কোদালপুরের মধ্যে এখন সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি কে?”

- “বিশিষ্ট ব্যক্তি মানে?”

- “সবচেয়ে ধনী বা প্রতিপ়ত্তিশালী।”

সুব্রত একটু ভেবে বললে, “এখানে এমন কেউ নেই, যাকে খুব ধনী বলা যায়। তবে এখানে এমন একজন লোক আছে, স্থানীয় বাসিন্দারা যাকে খুব মানে।”

- “মানে কেন?”

- “ভয়ে।”

- “ভয়ে?”

- “আজ্ঞে, হ্যাঁ। তার নাম প্রতাপ চৌধুরি। সে একজন দুর্দান্ত লোক। যে তার সঙ্গে শত্রুতা করেছে তাকেই বিপদে পড়তে হয়েছে। বার-দুয়েক খুনের মামলাতেও তাকে আসামি হতে হয়েছিল, কিন্তু দুই বারেই প্রমাণ অভাবে সে খালাস পায়। এখানকার কোনও লোকই তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস করে না।”

জয়ন্ত কৌতূহলী কণ্ঠে বললে , “বটে, বটে? তাহলে আরও ভালো করে লোকটির কথা বলুন তো সুব্রতবাবু।”

- “প্রতাপকে চোখে দেখে কিছু বোঝবার জো নেই। ফরসা রং, নাদুস-নুদুস মাঝারি চেহারা, সর্বদাই মিষ্টি হাসিমাখামুখ, এক জামা দুদিন পরে না-এমনি শৌখিন সে।”

- “তাহলে সে ধনবান?”

- “এইখানেই একটা আশ্চর্য রহস্য আছে। তার পৈতৃক সম্পত্তি নেই, সে নিজেও কোনও কাজকর্ম করে না, অথচ তার টাকার অভাব নেই। মাঝে-মাঝে সে বেশ কিছু দিনের জন্যে গ্রাম ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়-কেন যায়, কোথায় যায়, কেউ

তা জানে না। প্রতাপের সঙ্গে সর্বদাই একদল লোক থাকে, সে গ্রাম থেকে অদৃশ্য হলে তাদেরও আর দেখতে পাওয়া যায় না। লোকগুলোর চেহারা ভদ্র না হলেও চাকর-দারোয়ানেরও মতো নয়-কিন্তু তারা সকলেই জোয়ান”

জয়ন্ত বললে, “সুন্দরবাবু প্রতাপ কী রকম লোক বলে মনে করেন?”

- “সন্দেহজনক”

- “কেন?”

- “যে অর্থবান নয়, অথচ যার অর্থের অভাব নেই, সে লোকের উপর দৃষ্টি রাখা দরকার। এখানকার পুলিশের কাছে খবর নিলে প্রতাপ সম্বন্ধে হয়তো আরও নতুন কথা জানতে পারব।”

- “তার চেয়ে চলুন না, আমরা নিজেরাই গিয়ে প্রতাপবাবুর সঙ্গে একটু আলাপ জমিয়ে আসি।”

সুব্রত বললে, “আপনার এ আশা আজ সফল হবে না। আমি এখানে এসেই খবর পেয়েছি, প্রতাপ এখন কোদালপুরে নেই।”

জয়ন্ত বললে, “যাক, তাহলে আপাতত প্রতাপকে নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। এইবারে স্নানাহারের চেষ্টা করা যাক।”

সে উঠে দাঁড়াল এবং সেই মুহূর্তেই জানলা-পথ দিয়ে কী একটা জিনিস সাঁ করে তার মাথার পাশ দিয়ে ছুটে দেওয়ালে বাধা পেয়ে ঘরের মেঝের উপরে সশব্দে গিয়ে পড়ল!

জয়ন্ত সচমকে জিনিসটার দিকে তাকিয়েই এক লাফে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মানিক তাড়াতাড়ি জিনিসটা মাটির উপর থেকে তুলে নিলে।

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে বললেন, “হুম! ওটা যে দেখছি তির!”

জয়ন্ত বললে, “হ্যাঁ সুন্দরবাবু! ওটা যদি লক্ষ্যভেদ করতে পারত, তাহলে আর আমার স্নানাহারের দরকার হত না।”

সুব্রত বললে, “কে তির ছুড়লে? কেন ছুড়লে?”

- "কে ছুড়লে জানি না। জানলার কাছে এসে তো জনপ্রাণীকে দেখতে গেলুম না। তবে কেন যে ছুড়েছে, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। এই কোদালপুরে এমন কোনও মহাত্মা আছেন, যার ইচ্ছা নয় যে, আমি আর ধরাধামে বর্তমান থাকি।"

- "সে কী জয়ন্তবাবু, এখানে তো কারুরই আপনার উপরে রাগ থাকবার কথা নয়! এখানে কে আপনাকে চেনে?"

- "যাদের চেনা উচিত, তারাই চেনে! আমি সোনার আনারসের রহস্য উদ্ধার করতে এসেছি, আমাকে আবার তারা চিনবে না?"

- "তারা কারা?"

- "যারা আপনাকে আক্রমণ করে সোনার আনারসের ছড়া চুরি করে নিয়ে গিয়েছে, যারা বাগানের ঝোপে বসে আমাদের গতিবিধির উপরে লক্ষ রেখেছিল, যাদের দেখে ভূষোপাগলা আর্তনাদ করে উঠেছিল, তাদেরই অনুগ্রহ-দৃষ্টি পড়েছে আজ আমার উপরে। এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। সুন্দরবাবু, মানিক, আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে-এ শত্রু বড়ো সামান্য শত্রু নয়, এরা এখন আমাদের পিছনে পিছনেই ঘুরবে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "সুব্রতবাবু, এই বিশ শতাব্দীতেও তির ছোড়ে তো খালি অসভ্য দেশের লোকেরা! আরে ছ্যাঃ, আপনাদের কোদালপুর আমার একটুও ভালো লাগছে না।"

জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু বিশ শতাব্দীতেও সময়ে সময়ে আগ্নেয় অস্ত্রের চেয়ে তির বেশি কাজে লাগতে পারে। তির-ধনুক বন্দুকের মতন গর্জন করে পাড়া মাত করে না, কাজ সারে চুপিচুপি..আরে আরে সুন্দরবাবু আঙুল বুলিয়ে তিরের ফলার ধার পরীক্ষা করছেন কেন? ও তির যদি বিষাক্ত হয়?"

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে তিরটা মাটির উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "ও বাবা, ঠিক তো! এটা তো আমি ভাবিনি! একটু হলেই সর্বনাশ হয়েছিল আর কী, হুম!"



- "যাক, তিরন্দাজের কথা ভুলে এইবার স্নান-আহার সেরে নেওয়া যাক। বড়োই বেলা হয়েছে।"

সন্ধ্যার কিছু আগে জয়ন্ত বললে, "সুব্রতবাবু চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।"

বাইরে বেড়িয়ে সুব্রত জিজ্ঞেস করল, "জয়ন্তবাবু, কোন দিকে যাবেন?"

- "যেদিকে প্রতাপ চৌধুরির বাড়ি।"

- "কিন্তু সেখানে গিয়ে কী হবে? প্রতাপকে তো পাবেন না।"

- "প্রতাপকে না পাই, তার বাড়িখানাকে তো পাব।"

- "প্রতাপ যখন দলবল নিয়ে অদৃশ্য হয়, তখন তার বাড়ি তালাবন্ধ থাকে।"

- "থাকুক তালাবন্ধ। বাড়িখানাকে আমি একবার বাইরে থেকে দেখতে চাই। যে কোনও বাড়ি তার মালিকের অল্প-বিস্তর পরিচয় দিতে পারে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কী যে বলো জয়ন্ত, কিছু মানে হয় না।"

- "খুব হয়। একখানা বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় তার মালিক কোন প্রকৃতির লোক! সে ধনী, না মধ্যবিত্ত, না দরিদ্র? সে শৌখিন, না সাদাসিধে? এমন আরও অনেক কিছুই বাড়ি দেখে আমি বলে দিতে পারি।"

- "ইশ তাহলে আর ভাবনা ছিল না! কারুর বাড়ি দেখেই তুমি বলে দিতে পারো, সে সাধু, না চোর? সে গাঁজা খায়, না চণ্ডু খায়? যত সব বাজে ধাপ্পা।"

জয়ন্ত হেসে বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি বড্ড বেশি এগিয়ে যাচ্ছেন, অতটা আমি পারি না।"

মানিক বললে, "সুন্দরবাবু আপনি ঠিক বলেছেন। আপনার বসত-বাড়ি দেখে জয়ন্ত কিছুতেই বলতে পারবে না যে, তার মালিকের মাথায় আছে কাচের মতন তেলা টাক আর কোমরে আছে মস্ত বড়ো ঝোঝুল্যমান ভুঁড়ি! হ্যাঁ হে জয়ন্ত, তুমি তা বলতে পারবে কি?"

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, "মানিক, চিরদিনই কি তুমি সুন্দরবাবুকে চটাবার চেষ্টা করবে?"

সুন্দরবাবু প্রাণপণে মনের রাগ দমন করতে করতে বললেন, "হুম, মানিকের মতন ছ্যাঁচড়ার কথায় আমি আবার নাকি রাগ করব! আরে ছোঃ! মানিককে আমি ছুঁচোর মতন বাজে জীব বলে মনে করি।"

সুন্দরবাবুকে আরও বেশি রাগাবার জন্যে মানিক আবার কী বলবার উপক্রম করছিল, কিন্তু জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, "বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার সময় আমার নেই। চলুন সুব্রতবাবু, প্রতাপের বাড়ি আমাকে চিনিয়ে দিন।"

সকলে অগ্রসর হল।

কোদালপুর গ্রামখানি বিশেষ বড়ো গ্রাম নয়। কাঁচা পথ, তার এধারে-ওধারে মাঝে মাঝে দুচারখানা মেটেঘর এবং মাঝে মাঝে দু-একখানা কোঠাবাড়ি।

খানিক দূর অগ্রসর হয়ে পাওয়া গেল একখানা লাল রঙের তিনতলা বাড়ি। তার চারপাশে আছে পাঁচিল-ঘেরা খানিকটা ন্যাড়াজমি।

সুব্রত বললে, এই হচ্ছে প্রতাপের বাড়ি।'

সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত ভায়া, তুমি বাড়ি দেখে বাড়ির মালিককে নাকি চিনতে পারো? এ বাড়িখানাকে দেখে তোমার কি মনে হয়?"

জয়ন্ত বললে, "আমার কী মনে হয়? আমার মনে হয়, এ বাড়ির মালিক অত্যন্ত সাবধানী!"

- "মানে?"

- "মানে ওই বাড়ির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। প্রত্যেক ভদ্রলোকের বাড়ির জানলায় থাকে সোজা চার কি পাঁচটি গরাদ। কিন্তু এ বাড়ির জানলায় দেখছি, সোজা গরাদের সঙ্গে আড়াআড়ি লোহার গরাদ দেওয়া! তার মানে হচ্ছে, এই বাড়ির মালিক চান যে, বাইরের কোনও লোক সহজে যেন বাড়ির ভিতর ঢুকতে না পারে! এতটা সাবধানতার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও অর্থ আছে!"

সুব্রত বললে, "জয়ন্তবাবু, প্রতাপের বাড়ি দেখলেন তো?"

জয়ন্ত বললে, "দেখলুম বইকী! বাড়ির ফটকে মস্ত এক তালা লাগানো রয়েছে। তার মানে হচ্ছে, এই বাড়ির ভিতরে কোনও লোক নেই। আচ্ছা, আসুন! যখন বাড়িখানাকে পেয়েছি, তখন এর চারিদিকটা একবার প্রদক্ষিণ করে দেখা যাক!"

- "তাতে আমাদের কী লাভ হবে?"

- "লাভ? হয়তো কিছুই লাভ হবে না, তবু আরও কিছুক্ষণ পদচালনা করলে বিশেষ ক্ষতি হবারও সম্ভাবনা নেই বোধ হয়?"

সকলে বাড়ির চতুর্দিকে একবার ঘুরে এল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য আর কিছুই নজরে পড়ল না। বাড়ির প্রত্যেক জানলা বন্ধ, কোথাও জীবনের কোনও লক্ষণই নেই।

গ্রামের উপরে তখন ক্রমেই ঘন হয়ে উঠেছে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া। পাখির দল বাসায় ফিরে গিয়েছে, এখানে-ওখানে গাছের ওপর থেকে ভেসে আসছে তাদের বেলা-শেষের কলরব।

জয়ন্ত এক দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুন্দরবাবু বললেন, "আবার থমকে দাঁড়ালে কেন বাপু? শেষটা কি অন্ধের মতো সাপের খপ্পরে গিয়ে পড়বে?"

জয়ন্ত চোখ না ফিরিয়েই বললে, "সুব্রতবাবু, আপনি তো বললেন, এ বাড়ির ভিতরে লোকজন কেউ নেই?"

- "আজ্ঞে হ্যাঁ। স্বচক্ষেই তো দেখলেন বাড়ির বাইরে তালা দেওয়া!"

- "তা দেখেছি বটে। কিন্তু এখন আর একটা জিনিসও লক্ষ করছি।"

- "কী?"

- "ধোঁয়া।"

- "ধোঁয়া আবার কী?"

- "বাড়ির দোতলার কোণের ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখুন।"

সকলে সেই দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, একটা বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার পর ধোঁয়া।

জয়ন্ত বললে, "ধোঁয়া কি মানুষের অস্তিত্বই প্রমাণিত করে না?"

মানিক বললে, "বোধ হয় ওটা রান্নাঘর। কেউ উনুনে আগুন দিয়েছে।"

- "হুঁ। এখন আমাদের কী করা উচিত?"

সুন্দরবাবু বললেন, "এখন আমাদের কিছুই না করা উচিত। সোজা বাসায় ফিরে চল।"

- "তাই যাব। কিন্তু তারপর গভীর রাত্রে আবার আমরা এইখানেই ফিরে আসব।"

- "কেন?"

- "বাড়ির ভিতরটা দেখবার জন্যে আমার আগ্রহ হচ্ছে।"

- "দেখবে কেমন করে? দরজায় তো তালা বন্ধ! দরজা ভাঙবে?"

- "উঁহু। আগে বাইরের প্রাচীর লঙ্ঘন করব।"

- "তারপর?"

- "তেতলার ছাদ থেকে ওই যে বৃষ্টির জল বেরুবার নলটা মাটির দিকে নেমে এসেছে, ওইটে অবলম্বন করে সোজা ছাদের উপর গিয়ে উঠব।"

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "বলো কী হে? ওসব আমাকে দিয়ে হবে-টবে না বাপু! তারপর যদি ফস করে হাত ফসকে__উঃ!" তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না, শিউরে উঠে দুই চক্ষু মুদে ফেললেন।

জয়ন্ত বললে, "আপনি সুব্রতবাবুর সঙ্গে বাসাতেই থাকবেন। আমার সঙ্গে আসবে খালি মানিক।"

মানিক বললে, "রাজি!"

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

সেই রাত্রে

ঢং ঢং ঢং ঢং-

জয়ন্ত প্রথম রাত্রেই শয্যাগ্রহণ করেছিল এবং মানিকও। কিন্তু তাদের ঘুম অত্যন্ত সজাগ।

ঘড়ি বার-চারেক বাজতে না বাজতেই জয়ন্ত বিছানার উপরে ধড়মড় করে উঠে বসে ডাকলে, "মানিক!"

মানিকও ততক্ষণে বিছানার উপরে উঠে বসেছে। দুই হাতে চোখ কচলাতে কচলাতে বললে, "শুনেছি। রাত বারোটা বাজছে।"

- "আমাদের পোশাক পরাই আছে। উঠে পড়ো। ওই ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিতে ভুলো না। চলো, আর দেরি নয়।" জয়ন্ত গাত্রোত্থান করে নিজের ব্যাগটার দিকে বাহু বিস্তার করলে।

মানিক বললে, "সুন্দরবাবুর নাক এখনও গান গাইছে। যাবার সময় ওঁকে বলে গেলে হয় না?"

- "হুম! না, আমার নাক এখনও গান গাইছে না! তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি!"

মানিক সবিস্ময়ে ফিরে দেখল, সুন্দরবাবু জুলজুল করে তাকিয়ে আছেন তারই মুখের পানে! বললে, “কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। স্বচক্ষে দেখলুম আপনার নিদ্রিত চক্ষু, আর স্বকর্ণে শুনলুম আপনার জাগ্রত নাসিকা-ধ্বনি! অথচ আপনি-”

সুন্দরবাবু উঠে বসতে বসতে বাধা দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমার নাক ডাকলেও আর আমার চোখ বুজে থাকলেও আমি নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়িনি। তোমরা যাবে হাঁড়িকাঠে মাথা গলাতে আর আমি ঘুমিয়ে অজ্ঞান হয়ে থাকব? আমি কি অমানুষ? আমি কি তোমাদের ভালোবাসি না?”

জয়ন্ত বললে, “প্রতাপ চৌধুরির বাড়িখানাকে আপনি হাঁড়িকাঠ বলে মনে করেন নাকি?”

- “নিশ্চয়! প্রতাপ চৌধুরির যেটুকু বর্ণনা শুনেছি, তাই-ই যথেষ্ট! তার উপরে, এই কালো ঘুটঘুটে রাতে, নর্দমার নল বয়ে তোমরা ওঠবার চেষ্টা করবে এক অজানা শত্রুপুরীর তেতলায়! এমন অপচেষ্টার কথা কেউ কখনও শুনেছে নাকি? উঃ! তোমাদের এই মতলব শুনে পর্যন্ত বুক এত ধড়ফড় করছে যে, হয়তো আমার কোনও শক্ত ব্যামো হবে। এসব শুনেও কেউ কখনও নাকে সরষের তেল দিয়ে অঘোরে ঘুমোতে পারে?”

মানিক মুখ টিপে হেসে বললে, “আপনি নাসিকার জন্যে সরিষার তৈল ব্যবহার করেননি বটে, কিন্তু আপনার নাসিকা যে ভীষণ কোলাহল করছিল, সে-বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই!”

সুন্দরবাবু বিছানার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে মারমুখো হয়ে চিৎকার করে বললেন, “আমার নাসিকা কোলাহল করছিল, বেশ করছিল! আমার নাসিকা যত খুশি কোলাহল করতে পারে, তাতে তোমার কী হে বাপু? ফাজিল ছোকরা! খালি খালি আমার পিছনে লাগা?”

জয়ন্ত মৃদু হেসে বললে, “শান্ত হোন সুন্দরবাবু শান্ত হোন! মানিক, এখন মশকরা করবার সময় নেই। জানো, আমাদের সামনে রয়েছে কী গুরুতর কর্তব্য?”

মানিক বললে, “জানি জয়ন্ত, জানি! কিন্তু সুন্দরবাবুর মাথার উপরে ওই লাউয়ের মতন তেলা টাক, আর কাঁকড়ার দাড়ার মতন ওঁর ওই একজোড়া গোঁফ, আর ওঁর ওই থলথলে বিপুল ভুঁড়িটিকে দেখলেই আমার মন যেন অট্টহাস্য না করে

থাকতে পারে না। বেশ সুন্দরবাবু, আমাকে ক্ষমা করুন! আজকের মতো আমি মৌনব্রত অবলম্বন করলুম।"

সুন্দরবাবুর সমস্ত রাগ যেন জল হয়ে গেল একেবারে। তিনি হঠাৎ এগিয়ে এসে ডান হাতে জয়ন্তের কাঁধ এবং বাম হাতে মানিকের কাঁধ চেপে ধরে করুণ কণ্ঠে বললেন, "ভাই জয়ন্ত! ভাই মানিক! আমাকে এখানে একলা ফেলে কেন তোমরা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ?"

জয়ন্ত বললে, "আমি তো আপনাকে একলা থাকতে বলছি না। আপনিও তো অনায়াসেই আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন ।"

সুন্দরবাবুর দুই ভুরু উঠে গেল কপালের দিকে এবং তার সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল একটা প্রবল উত্তেজনার শিহরণ। আড়ষ্টভাবে তিনি বললেন, "হুম! ছাতের জল বেরুবার নল বয়ে আমি উঠব তেতলার উপরে? জয়ন্ত, তোমার মাথা কি একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে? হুম, হুম, হুম! আমার এই শরীরটিকে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না?"

- "বেশ তো, আপনি না হয় মাটির উপরে দাঁড়িয়ে থেকেই পাহারা দেবার চেষ্টা করবেন।"

- "পাগল! আজ আমি এখানে এক দিনেই তিন বার তিনটে গোখরো সাপকে স্বচক্ষে দেখেছি! এখানকার মাটি ছাতের জল বেরুবার নলের চেয়েও বিপজ্জনক। আমি ভাই ছাপোষা মানুষ--ঘরে আছে স্ত্রী আর আধ-ডজন ছেলেমেয়ে। আমার পক্ষে এত তাড়াতাড়ি যমালয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত নয়।"

জয়ন্ত দরজার দিকে অগ্রসর হতে হতে বললে, "বেশ, তাহলে আপনি নিরাপদে এইখানেই অবস্থান করুন। আমাদের আর বাধা দেবেন না__আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি জয়ন্তের সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বললেন, "তার চেয়ে জয়ন্ত, আমার আর একটা পরামর্শ শোনো।"

- "কী পরামর্শ?"

- "কালকেই টেলিগ্রাফ করে আমি এখানে একদল পুলিশফৌজ আনাব। তারপর সদল-বলে গিয়ে ঘেরাও করব প্রতাপ চৌধুরির বাড়ি।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "তা হয় না সুন্দরবাবু। হয়তো গ্রামের দিকে দিকে আছে প্রতাপ চৌধুরির চরেরা। এখানে হঠাৎ পুলিশফৌজের আবির্ভাব দেখলেই যথাস্থানে সেই খবর গিয়ে পৌঁছোবে। তারপর? তারপর আমরা দেখব গিয়ে খাঁচা খালি-পাখিরা কোথায় অদৃশ্য! এখন আর কথা-করবার সময় নেই। এসো মানিক !"

সুন্দরবাবু হতাশভাবে শয্যার উপরে বসে পড়লেন। তিনি আর একটিও বাক্যব্যয় করবার অবসর পর্যন্ত পেলেন না। জয়ন্ত এবং মানিক ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুতপদে।

আলো-হারা কালো রাতের বুকে জাগছিল খালি ঝিল্লিদের কণ্ঠ এবং থেকে থেকে তিমির-তুলি দিয়ে আঁকা গাছপালার পাতায় পাতায় বাতাস ফেলছিল সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস। কোথাও আর কোনও শব্দ নেই। রাতের নিজস্ব একটা ঝিমঝিম ধ্বনি আছে বটে, কি সে ধ্বনি কানে কেউ শোনে না, প্রাণে করে অনুভব।

নির্জন পল্লি-পথ। কাছে বা দূরে কোনও কুটির বা বাড়ির ভিতর থেকে ফুটে উঠছে না এক টুকরো আলোকরেখাও।

খানিক দূর অগ্রসর হবার পর জয়ন্ত হঠাৎ থমকে দাড়িয়ে পড়ল।

মানিক শুধোলে, "দাঁড়ালে কেন?"

- "পিছনে একটা শব্দ শুনলুম।"

- "কী রকম শব্দ?"

- "শুকনো পাতার উপরে পায়ের শব্দ।"

- "কুকুর কি শেয়াল যাচ্ছে।"

- "হতে পারে। চলো।"

কিছু দূর এগিয়ে জয়ন্ত আবার দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, "আবার পায়ের শব্দ শুনছি।"

এবারে মানিকও শুনতে পেয়েছিল। সে বললে, "জয়ন্ত, কেউ কি আমাদের অনুসরণ করছে?"

- "অসম্ভব নয়। কেউ হয়তো আমাদের গতিবিধির উপরে লক্ষ রেখেছে। টর্চ জ্বালো।"

জয়ন্ত ও মানিক দুজনেই টর্চ জ্বেলে দিকে দিকে আলোক নিক্ষেপ করলে। কোনও মনুষ্য-মূর্তির বদলে দেখা গেল, একটা শৃগাল ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে ঊর্ধবশ্বাসে।

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "কিন্তু আমরা যে শব্দ শুনেছি, তা শেয়ালের পায়ের শব্দ নয়। চুলোয় যাক। এগিয়ে চলো মানিক।"

- "কিন্তু পিছনে শত্রু নিয়ে কি সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে?"

- "কত ধানে কত চাল দেখাই যাক না। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।"

দুজনে অগ্রসর হল। কাছে এবং দূরে দুই গাছের ডালে বসে দুটো প্যাঁচা চ্যাঁ-চ্যাঁ ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন করছিল। রাত্রি-জগতের বিপুল কালো প্রজাপতির মতো একটা বাদুড় উড়ে গেল বাতাসকে সশবে ডানা দিয়ে আঘাত করতে করতে। তারপর আবার নিস্তব্ধতা।

পিছনে সেই পদশব্দ।

জয়ন্ত চুপি চুপি বললে, "শুনছ?"

- "হুঁ।"

- "এই ঝোপটার আড়ালে তাড়াতাড়ি বসে পড়ো।"

দুজনে গা-টাকা দিলে ঝোপের আড়ালে গিয়ে।

খানিকক্ষণ কিছু শোনা গেল না। তারপর মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল পায়ের শব্দ। বেশ বোঝা গেল, কেউ চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ছে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল একটা অস্পষ্ট অপচ্ছায়া।

ঝোপের প্রায় পাশে এসে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে মূর্তি নিজের মনেই বললে, "কী আশ্চর্য! এইখানেই তো ছিল, গেল কোথায়?"

জয়ন্ত হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে বাঘের মতন তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং নিজের দুই অতি বলিষ্ঠ বাহু বাড়িয়ে তাকে করলে প্রচণ্ড আলিঙ্গন।

আর্ত, অবরুদ্ধ কণ্ঠে লোকটা বললে, "ছেড়ে দাও-ছেড়ে দাও-আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!"

বাহুর বন্ধন একটু আলগা করে জয়ন্ত বললে, "কে তুই?"

- "আমি এই গাঁয়েই থাকি।"

- "তুই আমাদের পিছু নিয়েছিস কেন?"

- "না, আমি আপনাদের পিছু নিইনি। আমি ভিন গাঁয়ে গিয়েছিলুম, ফিরতে



রাত হয়ে গেল।"

- "তোর নাম কী?"

- "শ্রীমানিকচাঁদ বিশ্বাস।"

- "আরে, তুমিও মানিক? তাহলে এ যে হয়ে দাঁড়াল মানিক-জোড়! ওহে আমাদের পুরাতন মানিক, এখন এই নতুন মানিকটিকে নিয়ে কী করা যায় বলো দেখি?"

- "আপাতত হাত-পা-মুখ বেঁধে ওকে এই ঝোপের ভিতরে ফেলে রেখে যাওয়া যাক। তারপর বাসায় ফেরবার সময়ে ওর সঙ্গে ভালো করে আলাপ জমালেই চলবে।"

- "উত্তম প্রস্তাব। তাহলে এসো, আমাকে সাহায্য করো।"

- "আমাকে ছেড়ে দিন মশাই, ছেড়ে দিন! আমি নির্দোষ, নিরীহ ব্যক্তি!"

তার পকেট হাতড়ে জয়ন্ত আবিষ্কার করলে একখানা মস্ত বড়ো শাণিত ছোরা। বললে, "তুমি যে কী রকম নিরীহ ব্যক্তি, এই বাঘ-মারা ছোরাখানা দেখেই বেশ বুঝতে পারছি। মানিক, চটপট বেঁধে ফ্যালো এই খুনে গুন্ডাটাকে। আমাদের অনেক কাজ বাকি।"

লোকটার হাত-পা-মুখ বেঁধে তাকে ঝোপের ভিতরে নিক্ষেপ করে জয়ন্ত ও মানিক আবার হল অগ্রসর।

আরও খানিক পরে তারা এসে দাঁড়াল প্রতাপ চৌধুরির বাড়ির সুমুখে।

চারিদিক নিঃসাড় এবং নিবিড় অন্ধকারের কালো বনাত দিয়ে মোড়া। বাড়ির কোনওখানেই কোনও জীবনের লক্ষণ নেই।

অতি অনায়াসেই তারা পাঁচিল টপকে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তারা কান পেতে রইল, কিন্তু অন্ধকারের ভিতরে শুনতে পেলে না কোনওরকম সন্দেহজনক শব্দ।

জয়ন্ত ফিসফিস করে বললে, "মানিক, আমাদের ছাতে ওঠবার সিঁড়ি-অর্থাৎ বৃষ্টির জল বেরুবার সেই নলটা ওই দিকের কোথাও আছে। এখানে টর্চ ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। বাড়ির দেওয়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আমাদের নলটাকে খুজে বার করতে হবে।"

চক্ষু অন্ধকারে অন্ধ, কাজটা খুব সহজ হল না। কিন্তু অবশেষে পাওয়া গেল নলটাকে।

- "মানিক, একসঙ্গে আমাদের দুজনের ভার এই নলটা হয়তো সইতে পারবে না। তুমি নীচেই দাঁড়াও। আগে আমি ছাতে গিয়ে উঠি-তারপর তুমি।"

দুজনেই যখন ছাতের উপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন হঠাৎ রাত্রির স্তব্ধতাকে যেন খণ্ড খণ্ড করে দিয়ে কোথা থেকে চিৎকার করে উঠল একটা কুকুর। বার-তিনেক কেঁউ-কেঁউ করেই আবার সে চুপ করলে।

জয়ন্ত চিন্তিত স্বরে বললে, "মানিক, কুকুরটা হঠাৎ কেন ডাকলে?"

- "কুকুর কেন ডাকলে, কুকুরই তা জানে। কুকুরের ভাষা আমি শিখিনি।"

- "কিন্তু ওই কুকুরটার ডাক অস্বাভাবিক বলে মনে হল নাকি?"

- "তা হল বটে।"

- "আমার কী মনে হল, জানো?"

- "কী?"

- "ও যেন নকল কুকুরের ডাক।"

- "মানে?"

- "কুকুরের স্বরের অনুকরণে চিৎকার করলে যেন কোনও মানুষ।"

- "তুমি কী বলতে চাও জয়ন্ত?"

- "আমি বলতে চাই, ওটা কুকুরের ডাক নয়, মানুষের সঙ্কেত-ধ্বনি, কেউ যেন কাকে কোনও কারণে সাবধান করে দিলে।"

- "তাহলে শত্রুরা কি জানতে পেরেছে যে, তাদের আড্ডায় আবির্ভূত হয়েছে আমাদের মতন দুজন অনাহুত অতিথি?"

- "খুব সম্ভব, তাই।"

- "এ ক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিত?"

- "এখন উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন ভুলে যাও মানিক। এখন ছাতের উপরেই থাকি, আর নল বয়ে আবার নীচেই নেমে যাই, দুটোই হচ্ছে এক কথা। ওই কোণে রয়েছে চিলের ছাত। ওর তলায় আছে বাড়ির ভিতরে নামবার সিঁড়ি। এসো, মরবার বা বন্দি হবার আগে দেখেনি, এই বাড়ির ভিতরটা কী রকম! কোনও ভয় নেই, বিপদ নিয়েই তো আমাদের কারবার! এরও চেয়ে ঢের বেশি বিপদকে আমরা ফাঁকি দিয়েছি, আজও কি আর পারব না? এসো, দেখি-সাধুর সহায় ভগবান!"

চিলের কুঠুরির তলাতেই ছিল সিঁড়ি। জয়ন্ত ও মানিক দ্রুতপদে নীচের দিকে নেমে গেল- টর্চের আলো করলে তাদের পথনির্দেশ।

টর্চের আলো ফেলে ফেলেই খুব তাড়াতাড়ি তারা দেখে নিলে, এদিকে বারান্দার কোলে রয়েছে পাশাপাশি তিনখানা ঘর। প্রথম এবং দ্বিতীয় ঘরের দরজা তালাবন্ধ, কিন্তু তৃতীয় ঘরখানা তালাবন্ধ নয়-যদিও বাহির থেকে তার শিকল ছিল তোলা।

দুজনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, তিনতলা থেকে দোতলায় নামবে কী নামবে না, এমন সময় শোনা গেল বোধহয় একতলার সিঁড়িতে উচ্চ পদশব্দ! একজনের

নয়, দুইজনের নয়-অনেক লোকের পদশব্দ। এবং তারা উপরে উঠছে অত্যন্ত দ্রুতপদেই।

- "মানিক, মানিক!"

- "কী জয়ন্ত?"

- "ফাঁদে পড়েছি-এক রকম যেচেই। আর ভাববার সময় নেই। এই দুটো ঘরই তালাবন্ধ, কিন্তু ও-ঘরটার বাহির থেকে কেবল শিকল তোলা আছে। চলো, আমরা ওই ঘরেই ঢুকে ভিতর থেকে খিল এঁটে দি।"

- "কিন্তু তাহলে যে আমাদের অবস্থা হবে কলে-পড়া ইদুরের মতন!"

- "মোটেই নয়। অকারণেই আমরা 'অটোমেটিক' রিভলভার সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি। একটা কোণ পেলে হয়তো আমরা যুদ্ধ করে অনেক শত্রু বধ করতে পারব।"

চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে জয়ন্ত ও মানিক তৃতীয় ঘরের শিকল খুলে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দিলে। বাইরের দ্রুত পদশব্দগুলো তখন হাজির হয়েছে ত্রিতলের বারান্দার উপরে।

অকস্মাৎ অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকেই বিকট স্বরে হা-হা-হা-হা অট্টহাস্য করে কে বলে উঠল, "এসেছ বন্ধুগণ? এসো, এসো, আমি যে তোমাদেরই পথ চেয়ে আছি! হা-হা-হা-হা-হা!"

ঘরের বাইরে এবং ভিতরেও শত্রু। জয়ন্ত ও মানিক দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মতো। এতটা তারা কল্পনা করতে পারেনি!

।। পঞ্চম অধ্যায় ।।

তারপর

হা-হা-হা-হা-হা-হা! ঘরের ভিতরে আবার অট্টহাসি!

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি মানিকের হাত ধরে টেনে পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল যে-দিক থেকে

অট্টহাসি আসছিল না সেই দিকে। তারপর এমনভাবে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়াল, যেন পিছন থেকে কেউ তাদের আক্রমণ করতে না পারে।

ঘরের ভিতরে আবার বিদ্রুপ-ভরা কণ্ঠস্বর জাগল- "এসেছ বন্ধুগণ! এসো, এসো, আমি যে তোমাদেরই জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি!" তারপরই শুরু হল গান :

'এসো এসো বধু এসো,
আধ আঁচরে বোসো,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি!'

উদ্ভ্রান্ত কণ্ঠের এই হাসি, কথা ও গান শুনে সচকিত জয়ন্ত একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "কে তুমি? তোমার গলা যে চেনা-চেনা বোধ হচ্ছে।"

- "হচ্ছে না কি? হচ্ছে না কি? হা-হা-হা-হা! বন্ধ বন্ধুর গলা চিনবে না?"

- "তুমি হচ্ছো ভূষোপাগলা!"

- 'আয়নাতে ওই মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোটকা জট।

হা-হা-হা-হা-হা-হা! সোনার আনারসের এই ছড়া তোমরা জানো? তাহলে-"

কিন্তু ভূষোপাগলার কথা আর শেষ হল না, হঠাৎ বাহির থেকে ঘরের দরজার উপরে শোনা গেল দমাদ্দম পদাঘাতের শব্দ। একসঙ্গে অনেকগুলো পা দরজার পাল্লা ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে।

ঘরের ভিতরের বিপদ সম্বন্ধে জয়ন্ত তখন নিশ্চিন্ত হয়েছে-কারণ, পাগলা হলেও ভূষো নিশ্চয়ই বিপজ্জনক নয়! জয়ন্ত ছুটে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললে, "দরজা ভাঙবার চেষ্টা করো না! আমরা নিরস্ত্র নই!"

বাহির থেকে হো-হো করে হেসে সচিৎকারে কে বললে, "ওরে ছিঁচকে চোর! তুই কি ভেবেছিস আমরাও সশস্ত্র নই?"

- "আমাদের কাছে 'অটোমেটিক' রিভলভার আছে-এক মিনিটে তারা কতগুলো গুলিবৃষ্টি করতে পারে তা জানো?"

- "আমাদের দলে লোক আছে পনেরো জন। তোমরা দু-একটা গুলি ছুড়তে না ছুড়তেই আমরা তোমাদের দুজনকে কেটে কুচি-কুচি করে ফেলব।"

- "বেশ, চেষ্টা করে দেখতে পারো। ব্যাপারটা যা ভাবছ ততটা সহজ নয়।"

- "দেখ, ভালো চাস তো ভালোমানুষের মতন ধরা দে।"

- "তারপর?"

- "তারপর আবার কী?"

- "তারপর আমাদের নিয়ে তোমরা কী করবে?"

- "আগে ধরা তো দে, তারপর সেসব কথা নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে।"

- "চমৎকার! তোমার নাম কী বাছা?"

- "আমার নাম তো একটু আগেই তোরা শুনেছিস!"

- "কী রকম?"

- "আমার নাম মানিকচাঁদ বিশ্বাস।"

জয়ন্ত হো-হো করে হেসে উঠে সকৌতুকে বললে, "আরে, আরে, তুমি সেই ছোরাধারী মানিকচাঁদ-যাকে আমরা ঝোপের ভিতরে ঘাস-বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছিলুম? তোমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিলে কে হে?"

- "ওরে গঙ্গারাম, তুই কী ভেবেছিস এখানে আমি ছাড়া আর কেউ তোদের ওপরে দৃষ্টি রাখেনি? তোরা চলে আসবার তিন-চার মিনিট পরেই আমি মুক্তি পেয়েছি!"

- "বটে, বটে, বটে! তোমার সৌভাগ্যের কথা শুনে আমার হিংসে হচ্ছে যে!"

- "তার মানে?"

- "তুমি তো দিব্যি চট করে মুক্তি পেয়েছ। কিন্তু আমরা কি অত সহজে তোমাদের কদলী প্রদর্শন করতে পারব?"

- "সে আশায় জলাঞ্জলি দে। তোরা বাঘের গর্তে ঢুকেছিস। আমাদের গুপ্তকথা জানতে পেরেছিস। তোরা কি আর কখনও ছাড়ান পাবি বলে-আশা রাখিস?"

- "আশা রাখি বইকী মানিকচাঁদ, আশা রাখি বইকী, খুব রাখি! কিন্তু বাপু, যে গুপ্তকথাটা উল্লেখ করলে, ওর অর্থ কী? তোমাদের কোন গুপ্তকথা আমরা জানতে পেরেছি?"

- "ভূষোপাগলা যে এখানে আছে, এ কথা কি তোরা জানতে পারিসনি?"

- "এও আবার একটা গুপ্তকথা না কি? ভূষো তো পাগলা মানুষ, ও যেখানেই থাকুক তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে যাব কেন?"

- "তোরা তো ভূষোকে পাবার জন্যেই এখানে এসেছিস রে!"

- "মোটেই নয়।"

- "তবে কি তোরা এখানে এসেছিস হাওয়া খাবার জন্যে?"

- "আমরা এসেছি অন্য একটা কথা জানবার জন্যে।"

- "কী কথা?"

- "যে-বাড়ি সবাই জানে খালি বাড়ি, তার ভিতরে মানুষ থাকে কেন?"

- "এ কথা জেনে তোদের লাভ?"

- "লাভালাভের ধার ধারি না, আমরা এসেছি কৌতুহল চরিতার্থ করতে।"

- "কৌতুহল চরিতার্থ করতে না আত্মহত্যা করতে?"

- "আমরা আত্মহত্যা করতে মোটেই রাজি নই। যাক, এসব বাজে কথা! মানিকচাঁদ তোমার সঙ্গে তো অনেকক্ষন আলাপ হল, এইবার আমরা আর একজনের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।"

- "কার সঙ্গে?"

- "তোমাদের কর্তা প্রতাপ চৌধুরিকে ডাকো।"

- "তিনি তো এখন কলকাতায়!"

- "এটা কি সত্য কথা?"

- "তিনি এখানে থাকলে তোর মতো পাজির-পা-ঝাড়ার সঙ্গে কথা কয়ে আমাকে মুখব্যথা করতে হত না। '

- "ও, আপাতত তুমিই বুঝি এখানকার প্রধানসেনাপতি?"

- "না, আপাতত আমিই এ-বাড়ির মালিক।"

জয়ন্ত সবিস্ময়ে বললে, "তার মানে?"

- "প্রতাপবাবুর সঙ্গে এখন এ-বাড়ির আর কোনওই সম্পর্ক নেই।"

- "সম্পর্ক নেই! কেন?"

- "বাড়িখানা তিনি আমার কাছে বিক্রি করেছেন। প্রতাপবাবু এ গ্রামে আর থাকতে চান না।"

- "কেন, এ গ্রামটি তার পক্ষে কি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে?"

প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। নতুন এক গলায় শোনা গেল,-"মানিক, তুমি লোকটার সঙ্গে এত কথা কইছ কেন বলো দেখি? তুমি কি বুঝতে পারছ না, ও তোমার পেটের কথা আদায় করবার চেষ্টা করছে?"

- "ঠিক বলেছিস ভজা! ধড়িবাজটার সঙ্গে আর কোনও কথা নয়। ওহে জয়ন্ত, এইবার শেষ বার জিজ্ঞাসা করছি, দরজা তোমরা খুলবে, না আমরা ভেঙে ফেলব?"

- "দরজা আমরা খুলব না, ভাঙতে চাও তো তোমরাই ভাঙো।...আমরা তোমাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে প্রস্তুত। মানিক, রিভলভার বার করে দরজার পাশে এসে দাঁড়াও। দরজা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দুজনে গুলিবৃষ্টি করব। হতভাগারা বোধহয় 'অটোমেটিক' রিভলভারের মহিমা জানে না।" শেষের কথাগুলো জয়ন্ত এমন চিৎকার করে বললে যে বাইরের সবাই শুনতে পেলে।

কিন্তু বাহির থেকে দরজা ভাঙার কোনও চেষ্টাই হল না। কেবল শোনা গেল, মানিকচাঁদরা পরস্পরের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা কইছে। তারপর তাদের কণ্ঠস্বর হল একেবারে নীরব।

জয়ন্ত মুখ ফিরিয়ে ঘরের অন্য দিকের একটা খোলা জানলার ভিতর দিয়ে বাহিরটা একবার দেখবার চেষ্টা করলে। কিন্তু দেখা গেল কেবল অন্ধকার। রাত্রি তখন দিবসের দিকে অগ্রসর হয়েছে বটে, কিন্ত আকাশের কালিমা পাতলা হবার কোনও লক্ষণই নেই। পৃথিবীও যেন বোবা হয়ে আছে।

মানিক চুপি চুপি বললে, "জয়ন্ত, ওরা বোধহয় আজ রাতে কোনও গোলমাল করবে না।"

- "হুঁ, আমারও তাই বিশ্বাস। ওরা ভোরের জন্য অপেক্ষা করছে, রাতের অন্ধকারে ওরা আমাদের গুলি হজম করতে রাজি নয়। এখন দেখা যাক, এই

অন্ধকারের সুযোগ আমরা গ্রহণ করতে পারি কি না! আস্তে আস্তে একবার জানলার কাছে গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো দেখি!"

মানিক জানালার কাছে গিয়ে নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। তারপর ফিরে এসে বললে, "নীচের জমির দিকে তাকিয়ে মনে হল, কারা যেন এদিক-ওদিক চলাফেরা করছে।"

- "মানিকচাঁদ তাহলে ওদিকেও পাহারা রাখতে ভোলেনি। দেখছ আমাদের অদৃষ্ট মন্দ।"

- "কালকের প্রভাত হয়তো আমাদের পক্ষে সুপ্রভাত হবে না।"

এতক্ষণ পরে ভূষোপাগলা হঠাৎ মুখ খুলে বলে উঠল, "সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! আমি জানি আমার জীবনে আর সুপ্রভাত আসবে না। কিন্তু তোমরা কে বাপু? তোমরা এখানে কেন?"

জয়ন্ত বললে, "মানুষ নিজের বিপদকে কতখানি বড়ো করে দেখে বুঝেছ তো মানিক! ভূষোপাগলা যে আমাদের সঙ্গেই আছে, এ-কথা আমরাও ভুলে গিয়েছিলুম। যাক, এ তবু মন্দের ভালো। ভূষোর সঙ্গেই কথাবার্তা কয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক।" এই বলে সে টর্চের আলো জ্বেলে দেখলে, ঘরের মেঝের উপরে ভূষোপাগলা লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে।

মানিক বললে, "এ কী ভূষণ, তোমার মাথায় আর মুখে যে চাপ চাপ শুকনো রক্ত!"

ভূষো হেসে বললে, "দুশমনরা লাঠি মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়ে আমাকে এখানে ধরে এনেছে। এই দ্যাখো না, আমার হাত-পা-ও বাঁধা!"

জয়ন্ত বললে, "আহা, বেচারি! মানিক, ওর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দাও।"

বাঁধন খুলে দিতে দিতে মানিক বললে, "আচ্ছা ভূষণ, তোমার মতন নিরীহ মানুষের উপরে এমন অত্যাচার কেন? তুমি কি ওদের কোনও অনিষ্ট করেছ?"

ভূষো মাথা নেড়ে বললে, "কিছু না, কিছু না। নিজের উপকার কী পরের উপকার, কিছুই আমি করতে পারি না। আমি খালি খাই-দাই, বগল বাজাই আর সোনার আনারসের গান গাই!"

- "তবে ওরা তোমাকে ধরে রেখেছে কেন, সে-কথা কি জানো?"

- "ওদের মুখেই শুনে জেনেছি।"

- "কী জেনেছ?"

- "আমি সোনার আনারসের ছড়া জানি বলেই ওরা আমাকে ধরে রেখেছে!"

- "তাই নাকি?"

- "হ্যাঁ। ওরা আমাকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে। ওদের বিশ্বাস, আমি আরও অনেক কথা জানি।"

জয়ন্ত বললে, "বটে, বটে? তুমি আরও অনেক কথা জানো নাকি?"

- "অনেক কথা জানি গো, আবার অনেক কথা জানি না!"

- "তুমি কী কী কথা জানো ভূষণ?"

ভূষোর দুই চক্ষে ফুটল সন্দেহের ভাব। সে বললে, "আমার কথা তুমি জানতে চাও কেন? ও, তুমিও বুঝি ওই দলে? ভুলিয়ে আমার মনের কথা জেনে নিতে চাও!"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বললে, "না ভূষণ, আমরা তোমার বন্ধু, তোমাকে উদ্ধার করতেই এখানে এসেছি।"

- "হা-হা-হা-হা! আমরা তিনজনেই যে ইঁদুর-কলে ধরা-পড়া ইঁদুর! এখন কে কাকে উদ্ধার করে?"

- "ভূষণ, লোকে তোমাকে পাগল বলে বটে, কিন্তু তোমার কথাবার্তা তো ঠিক পাগলের মতন নয়!"

- "লোকে ঠিক বলে গো, ঠিক বলে! আমি পাগল নই তো কী? ওই সোনার আনারসের ছড়াই আমাকে পাগল করেছে।"

- "ছড়া আবার কারুকে পাগল করতে পারে নাকি?"

- "সোনার আনারসের ছড়ার মানে বুঝলে পাগল হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ও বড়ো বিষম ছড়া গো, মানুষকে মত্ত করে তোলে!"

- "কিন্তু ছড়ার শেষটা তো তুমি এখনও আমাদের শোনাওনি!"

- "শুনবে? তা শোনাতে আমার আপত্তি নেই। আমার মুখে এ ছড়াটা তো আরও কত লোকে শুনেছে, কিন্তু কেউ পারেনি এর মানে বুঝতে?"

- "আমিও মানে বুঝতে পারব না, তবু ছড়ার সবটা শুনতে ক্ষতি কী?"

- "তবে শোনো-

ভূষোকে বাধা দিয়ে হঠাৎ ঘরের বাহির থেকে সগর্জনে কে চিৎকার করে উঠল, “খবরদার ভূষো, খবরদার! ছড়াটা ওদের কাছে বললে তোকে আমরা এখনই খুন করে ফেলব!”

ভূষো ভয়ে কুঁচকে পড়ে বললে, “শুনছ তো? ঘরের বাইরে দুশমনরা আড়ি পেতেছে? আর ছড়া বলে কাজ নেই বাবা!”

জয়ন্ত বললে, “কাকে তুমি ভয় করছ ভূষণ ? ওদের বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর! দেখলে তো, আমাদের ভয়ে ওরা দরজা ভাঙতে সাহসই করলে না!”

দরজার দিকে ত্রস্ত চক্ষে বার বার তাকাতে তাকাতে ভূষো বললে, “তাহলে ছড়ার শেষটা বলব?”

- “নিশ্চয়ই বলবে! দেখি কে তোমার কী করে!”

ভূষো বললে:

‘বাঘরাজাদের রাজ্য গেছে,
কেবল আছে একটি স্মৃতি,
ব্রহ্মপিশাচ পানাই বাজায়,
বাস্তুঘুঘু কাঁদছে নিতি।
সেইখানেতে জলচারী,
আলো-আঁধির যাওয়া-আসা,
সর্পনৃপের দর্প ভেঙে,
বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা।’

জয়ন্ত খানিকক্ষণ ধরে লাইনগুলো মনে মনে আউড়ে নিয়ে বললে, “ভূষণ, তোমার ছড়ার সবটাই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।”

- “মানে বুঝতে পারলে?”

- “পরে সে চেষ্টা করে দেখব বইকী!”

- “পরে কি আর সময় পাবে?”

- “কেন পাব না?”

- “আমরা যে কলে-পড়া ইঁদুর!”

জয়ন্ত উত্তর না দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

বাইরে অন্ধকার তখন আর ততটা নীরন্ধ্র নয়। পুবের আকাশে আলোকের প্রথম ইঙ্গিত জাগতে আর বেশি দেরি নেই। বাতাসে পাওয়া যাচ্ছে আসন্ন প্রভাতের প্রসন্ন স্নিধতা।

আচম্বিতে ওদিককার খোলা জানলাটার ওপাশে হল কালো অপচ্ছায়ার মতন একটা মূর্তির আবির্ভাব এবং চোখের পলক পড়বার আগেই মূর্তিটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, ঘরের ভিতরে কী একটা জিনিস নিক্ষেপ করে!



পরমুহূর্তে ভীষণ এক শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরটা ভরে উঠল বিষম তীব্র এক দুর্গন্ধে!

জয়ন্ত প্রায়বদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, "জানলার দিকে চলো-জানলার দিকে চলো! ওরা বিষাক্ত গ্যাসের বোমা ছুড়েছে! উঃ!"

কিন্তু তারা কেউ জানলা পর্যন্ত পৌঁছোতেই পারলে না, সবাই মাটির উপরে পড়ে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল!

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

'ডোল ডোল'

জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্ত দেখলে, তার বুকের উপরে ঝুঁকে রয়েছে একখানা উদ্বিগ্ন মুখ! সে মুখ সুন্দরবাবুর।

সুন্দরবাবু উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, "হুম, বাঁচলুম! জয়ন্তের জ্ঞান হয়েছে!"

জয়ন্ত শান্তস্বরে বললে, "আমার কী হয়েছে সুন্দরবাবু? চোখে কেন ঝাপসা দেখছি-মাথার ভিতরে বিষম যন্ত্রণা, নিঃশ্বাস টানতেও কষ্ট হচ্ছে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "তোমরা কোথায় গিয়েছিলে তা কি মনে পড়ছে না?"

_ "কোথায়?"

- "প্রতাপ চৌধুরির বাড়িতে।"

ধাঁ করে জয়ন্তের মনের পটে ফুটে উঠল যেন একখানা বিদ্যুতে আঁকা চলচ্চিত্র! দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্তন! নিশীথ রাত্রি, মানিকচাঁদের আবির্ভাব, প্রতাপ চৌধুরির বাড়ি, শত্রুদের আক্রমণ, অন্ধকার ঘর, ভূষোপাগলার অট্টহাসি-তারপর বিষাক্ত বোমার বিস্ফোরণ!

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি উঠে বসবার চেষ্টা করতেই সুন্দরবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "না জয়ন্ত, না! ডাক্তারবাবু বলে গিয়েছেন, এখনও দু-তিন দিন তোমাকে বিছানাতেই শুয়ে থাকতে হবে।"

- "মানিক কোথায়, মানিক?"

ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে ক্ষীণস্বরে জবাব এল, "জয়, এই যে আমি! তোমার আগেই আমার জ্ঞান হয়েছে। কিন্তু শরীরে যেন আর পদার্থ নেই!"

- "ভগবানকে ধন্যবাদ, মানিকও আমার সঙ্গে আছে! ভূষোপাগলার খবর কী?"

সুন্দরবাবু বললেন, "তাকেও এনেছি, তার জ্ঞান হয়েছে সকলের আগে!"

- "কোথায় সে?"

- "এই বাড়িরই অন্য একটা ঘরে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে।"

জয়ন্ত অল্পক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগল। তারপর বললে, "সুন্দরবাবু, ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। কালকের নাট্যাভিনয়ে আপনার আবির্ভাব হল কোন ভূমিকায়, কখন আর কোথায়?"

সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত, তুমি বড়ো বেশি বকাবকি করছ। আগে আর একটু সুস্থ হও, তারপর কাল সব শুনো।"

সত্য কথা। জয়ন্তের মাথার ভিতরটাও তখনও রীতিমতো ধোঁয়াটে আর ঘোলাটে হয়ে ছিল এবং থেকে থেকে তার দমও যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু নিজের সমস্ত দুর্বলতাকে প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দমন করে সে বললে, "সুন্দরবাবু, সব কথা না শুনলে মন আমার শান্ত হবে না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তা আবার আমি জানি না? ও মন আবার শান্ত হবে? হুম! ও মন যে দুর্দান্ত মন! সব জানি, সব জানি!"

জয়ন্ত হাসবার চেষ্টা করে বললে, "জানেন তো কষ্ট দিচ্ছেন কেন? এই আমি দুই চোখ বন্ধ করে খুলে রাখলুম কেবল দুই কান! এখন খুলুন আপনার মুখ!"

ওদিককার বিছানা থেকে মানিক তেমনি ক্ষীণ স্বরেই বললে, "কিন্তু সাবধান সুন্দরবাবু, সাবধান!"

সুন্দরবাবু চমকে উঠে ঘরের এদিক-ওদিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, "সাবধান হতে বলছ কেন মানিক?

- "ম্যালেরিয়ার মশা কামড়ালেই ম্যালেরিয়া হয়।"

- "হোক গে, তাতে আমার কী?"

- "এখানে ম্যালেরিয়ার মশা আছে।"

- "এই বিশ্রী পাড়াগাঁয়ে যে লাখো লাখো ম্যালেরিয়ার মশা আছে, তা কি আমি জানি না? কিন্তু আচমকা তুমি ধান ভানতে শিবের গান গাইছ কেন?"

- "জয়ন্ত আপনাকে মুখ খুলতে বলছে। কিন্তু যে মশারা বাইরে থেকে কুটুস করে কামড়ালেই ম্যালেরিয়ায় ধরে, মুখ খোলা পেয়ে সেই বেপরোয়া মশারা যদি দল বেঁধে আপনার বিপুল ভুঁড়ির অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে আপনি তাদের হজম করতে পারবেন কি? তারা হুল ফুটিয়ে দেবে আপনার পিলে, লিভার আর হৃদপিণ্ড প্রভৃতির উপরে! তখন? তখন কী হবে? এইসব ভেবেচিন্তেই আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি! এখানে মুখ খোলা নিরাপদ নয় সুন্দরবাবু! আমি আপনার বন্ধু, আপনার হাপরের মতন মস্ত উদর যে ম্যালেরিয়ার আস্তানায় পরিণত হয়, এটা আমি ইচ্ছা করি না। সাবধান!"

সুন্দরবাবু রেগে তিড়বিড় করতে করতে বললেন, "মানিক! তুমি হচ্ছ ঝাল ধানি-লঙ্কার মতো অসহনীয়! প্রায় মরতে বসেছ, তবু জোঁকের মতো আমার পিছনে লাগতে ছাড়বে না?"

মানিক ঠোঁট টিপে চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললে, "আপযেন বড্ড ভালোবাসি সুন্দরবাবু আপনাকে কি ছাড়তে পারি ?" এই বলেই সে বিছানার উপরে টপ করে উঠে বসে দুই বাহু বিস্তার করে বললে, "আমি আপনাকে ছাড়ব? আমি এখনই শয্যা ছেড়ে আপনাকে পরম শ্রদ্ধাভরে আলিঙন করব!"

সুন্দরবাবু এক লাফে তার কাছে গিয়ে পড়ে চিৎকার করে বললেন, "মানিক! আমি নিষেধ করছি-তুমি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না! ডাক্তার বলেছেন, তাহলে তোমার অসুখ বাড়বে। শুয়ে পড়ো, এখনই শুয়ে পড়ো!"

মানিক খাট ছেড়ে নামবার চেষ্টা করে মাথা নেড়ে বললে, "না, আমি আপনাকে ছাড়ব না! আমি আপনাকে আলিঙ্গন করবই করব!" সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন এবং তারপর তাকে ধীরে ধীরে আবার বিছানার উপরে শুইয়ে দিয়ে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, "মানিক, অকারণে বাক্য-বিষ ছড়িয়ে কেন আমায় জ্বালাও বলো দেখি? কেন তুমি খালি খালি আমাকে রাগিয়ে দাও? তুমি কি জানো না, জয়ন্ত আর তোমাকে আমি কত ভালোবাসি? হুম!"

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বললে, "মানিক, তোমার এই অসাময়িক প্রহসনের অভিনয় আজ আমার ভালো লাগছে না! যেখানে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর যুদ্ধ, সেখানে প্রহসন আমি পছন্দ করি না। আসুন সুন্দরবাবু, বলুন আপনার কথা।"

মানিক খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, "জীবন আর মৃত্যু নিয়ে শখের খেলাই হচ্ছে যে আমাদের ব্যাবসা! প্রহসনের অভিনয় তো এখানেই সাজে!"

- "হাত জোড় করি ভাই মানিক! তোমার দার্শনিকতার লেকচার থামাও, সুন্দরবাবুর কথা শুনতে দাও।"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমার কথা বলব কী ভাই জয়ন্ত, সব কথা আমি নিজেই এখনও ভালো করে বুঝতে পারিনি। রাত্রিবেলায় তুমি আর মানিক তো প্রতাপ চৌধুরির বাড়ির দিকে যাত্রা করলে, আমি একলা ঘরে বসে বসে ভাবতে লাগলুম কত রকম দুর্ভাবনা! ঘণ্টার পর ঘন্টা কেটে গেল, শেষ-রাতের অন্ধকার ঠেলে ফুটল সকালের আলো, তবু তোমাদের দেখা নেই! ভেবে ভেবে আমি পাগলের মতন হয়ে, উঠলুম। বুঝলুম নিশ্চয়ই তোমরা কোনও বিপদে পড়েছ। হয়তো তোমরা আর বেঁচে নেই, এমন সন্দেহও হল। সুব্রতবাবুও বললেন, মানুষ খুন করতে নাকি প্রতাপ চৌধুরির একটুও বাধে না। হাজার হোক আমি পুলিশের লোক তো, এই কাজে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছি-হুম, ভেবে সারা হলেও বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি না! দুশ্চিন্তার কালো মেঘের মধ্যে হঠাৎ আবিষ্কার করলুম একটুখানি আশার আলো! সুব্রতবাবুকে নিয়ে ছুটলুম এখানকার থানায়। নিজের আর তোমাদের পরিচয় দিয়ে দারোগাবাবুর কাছে সব কথা খুলে বললুম। তিনি তখনই কয়েকজন চৌকিদার নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তোমাদের খোঁজে সকলে মিলে ছুটলুম প্রতাপ চৌধুরির বাড়ির দিকে। বাড়ির সদর দরজায় তখন আর বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল না। পাল্লা দু-খানা বন্ধ ছিল ভিতর দিক থেকেই। কিন্তু যখন ডাকাডাকির পরেও কারুর সাড়া পাওয়া গেল না, তখন দরজা ভেঙেই আমরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলুম। তারপর দেখলুম, উঠানের উপরে পড়ে রয়েছে তোমাদের তিনজনের অচেতন দেহ। তারপর-"

জয়ন্ত বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আমাদের দেহ ছিল কোথায়?"

- "বাড়ির একতলার উঠানের উপরে।"

মানিক বললে, “কিন্তু বিষাক্ত গ্যাসের বোমায় আমরা জ্ঞান হারিয়েছিলুম দোতলার একখানা ঘরের ভিতরে।”

জয়ন্ত বললে, “বোঝা যাচ্ছে শত্রুরা আমাদের দেহগুলোকে একতলায় নামিয়ে এনেছিল।”

- “কিন্ত কেন?”

- “খুব সম্ভব তারা চেয়েছিল আমাদের দেহগুলোকে স্থানান্তরে সরিয়ে ফেলতে! কিন্তু যথাসময়ে সদলবলে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব হয়েছিল তাই রক্ষা, নইলে আমাদের কি দুর্দশা হত কে জানে?”

- “জয়ন্ত, তুমি শত্রু শত্রু করছ বটে, আমরা কিন্তু সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনও শত্রুর একগাছা টিকি পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারিনি।”

- “তারা আপনাদের দেখে চম্পট দিয়েছিল।”

- “তাও সম্ভবপর নয়। পাছে তারা পালায় তাই আমরা চারিদিক থেকে বাড়িখানাকে ঘিরে অগ্রসর হয়েছিলুম।”

- “তবে তারা পালাল কেমন করে?”

- “সেইটেই তো সমস্যা! আর একটা কথাও মনে রেখো, বাড়ির সদর দরজা বন্ধ ছিল ভিতর দিক থেকে।”

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বললে, “হ্যাঁ, এটা একটা ভাববার কথা বটে। ও-বাড়ির সদরে বাইরে তালা দেওয়া থাকলেও ভিতরে বাস করে মানুষ । আবার ও-বাড়ির সদর ভিতর থেকে বন্ধ থাকলেও ভিতরে ঢুকে মানুষের খোঁজ পাওয়া যায় না। এ এক অদ্ভুত রহস্য!”

ঠিক সেই সময়ে একটি নতুন লোক ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন।

সুন্দরবাবু বললেন, “নমস্কার দারোগাবাবু। নতুন কোনও খবর আছে?”

- “আছে।”

- “কী?”

- “প্রতাপ চৌধুরির বাড়িতে আমার এক চৌকিদারকে পাহারায় রেখে এসেছিলুম জানেন তো? আজ সে মারা পড়েছে।”

- “কেন?”

- "কে তাকে খুন করেছে।"

- "খুন?"

- "হ্যাঁ। আমরা যখন ঘটনাস্থলে যাই, তখনও সে বেঁচেছিল বটে, তবে সেটা না-বাঁচারই সামিল। কারণ দু-চার বার অস্ফুট স্বরে 'ডোল' 'ডোল' বলেই সে মারা পড়ে। তার বুকে আর মুখে ছোরা মারার চিহ্ন।"

জয়ন্ত বললে, "ডোল মানে?"

- "চৌকিদার ঠিক কী বলতে চেয়েছিল, আমিও তা বুঝতে পারিনি! তবে এটা দেখেছি, প্রতাপ চৌধুরির বাড়ির একতলায় সিঁড়ির খিলানের তলায় একটা চৌবাচ্চার মতন বড়ো লোহার ডোল বা জলাধার আছে! চৌকিদারের দেহ পাওয়া যায় ঠিক তার পাশেই। কিন্তু তার সঙ্গে চৌকিদারের মৃত্যুর কী সম্পর্ক থাকতে পারে?"

সুন্দরবাবু বললেন, "বোধহয় মরবার সময়ে লোকটা প্রলাপ বকছিল।"

- "আমারও তাই বিশ্বাস!"

জয়ন্ত বললে, "আমার বিশ্বাস অন্যরকম।"

- "কী রকম?"

- "আপনারা খুব সহজেই ব্যাপারটাকে হালকা করে ফেলতে চাইছেন। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই হালকা নয়।"

- "কেন?"

- "চৌকিদার যে প্রলাপ বকছিল, তার কোনও প্রমাণ আছে?"

- "প্রলাপ বলে অর্থহীন কথাকেই।"

- "কে বললে চৌকিদারের কথা অর্থহীন? আপনারা তার মুখে শুনেছেন 'ডোল' শব্দটি। আপনারা কি 'ডোল' বা জলাধার খুঁজে পাননি?"

- "কিন্তু খুঁজে পেয়েও আপনাদের কোনও সমস্যার সমাধান হয়েছে?"

- "সেইটেই বিবেচ্য। অন্তিমকালে চৌকিদারের কথা বলবার শক্তি প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল। সে-সময়েও সে যখন কোনওরকমে 'ডোল' শব্দটি উচ্চারণ করে ওইদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল, তখন তার কথার ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ অর্থ আছে। এই বিশেষ অর্থটি ধরতে পারলেই হত্যা-রহস্যের কিনারা হতে দেরি লাগবে না।"

দারোগাবাবু বললেন, "ডোলটি আমি পরীক্ষা করেছি। তার তলায় পড়ে আছে ইঞ্চি পাঁচেক অতি ময়লা পোকা-ভরা জল-ব্যাস, আর কিছুই নেই।"

- "অতি ময়লা পোকা-ভরা জল? তার মানে সে জল কেউ ব্যবহার করত না?"

- "তাই তো মনে হয়।"

- "তাহলে খানিকটা অব্যবহার্য জল ভরে ওখানে অত বড়ো একটা ডোল বসিয়ে রাখবার কারণ কী?"

- "কেমন করে বলব?"

জয়ন্ত হঠাৎ প্রশ্ন করলে, "দারোগাবাবু, এখানে পালকি পাওয়া যায়?"

- "যায়। কিন্ত কেন?"

- "আমি এখনই ঘটনাস্থলে যেতে চাই।"

সুন্দরবাবু হাঁ-হাঁ করে বলে উঠলেন, "তোমার দেহের এই অবস্থায়? অসম্ভব, অসম্ভব!"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "খুব সম্ভব, খুব সম্ভব! আমি তো পায়ে হেঁটে যাচ্ছি না! আমি জানতুম আপনি আপত্তি করবেন, তাই তো পালকিতে চড়ে যাব রুগির মতো।"

মানিক বললে, "আর আমি?"

- "আপাতত তুমি শয্যাগত হয়েই থাকো। এক সঙ্গে দু-দুটো রুগিকে সুন্দরবাবু সামলাতে পারবেন কেন?"

আবার প্রতাপ চৌধুরির বাড়ি। তার চারিদিকে কড়া পুলিশ পাহারা।

উঠানের উপর দাঁড়িয়ে দারোগাবাবু বললেন, "সিঁড়ির খিলানের তলায় ওই দেখুন সেই ডোলটা। ওরই পাশে চৌকিদারের দেহ পাওয়া যায়।"

জয়ন্ত ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। একটা গোলাকার লোহার জলাধার। উচ্চতায় আড়াই হাত এবং চওড়ায় তিন হাত। তলার দিকে পড়ে রয়েছে খানিকটা ঘোলা জল।

দারোগাবাবু কৌতুকপূর্ণ হাসি হেসে বললেন, "এর ভিতর থেকে আপনি কোনও বিশেষ অর্থ আবিষ্কার করতে পারলেন কি?"

- "কই, এখনও তো কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি।"

- "পরেও পারবেন না মশাই, পরেও পারবেন না! আমাদের হচ্ছে পেশাদার শিকারির চোখ, যা দেখবার তা আমরা একদৃষ্টিতে দেখে নি!"

- "তা আর বলতে? আপনাদের সঙ্গে আবার আমার তুলনা? কিন্তু দারোগাবাবু আপনার কাছে আমার একটি আরজি আছে।"

- "বলুন।"

- "ডোলটার ভিতরে জল আছে অল্পই, ওটা বোধহয় বেশি ভারী নয়। অনুগ্রহ করে আপনার চৌকিদারদের হুকুম দিন, অন্ধকার খিলানের তলা থেকে ডোলটাকে উঠানের মাঝখানে টেনে আনতে। আমি ওটাকে আরও ভালো করে দেখতে চাই।"

- "খুব ভালো করে দেখুন, ভালো করে, প্রাণ ভরে, নয়ন ভরে দেখুন, আমার একটুও আপত্তি নেই। ওরে, তোরা ডোলটাকে উঠানের মাঝখানে টেনে আন তো! আমাদের শখের গোয়েন্দামশাই ওটাকে ভালো করে দেখতে চান!"

দারোগাবাবু গলা চড়িয়ে হাসতে লাগলেন, কিন্তু সুন্দরবাবু হাসবার চেষ্টা করলেন না। জয়ন্তকে তিনি চিনতেন। আগে আগে তাঁকেও হাস্য করে বারংবার ঠকতে হয়েছে। জয়ন্ত অকারণে কিছু করে না, দারোগার হাসি বন্ধ হতে আর দেরি নেই বোধহয়। জয়ন্তের কথাবার্তায় পাওয়া যাচ্ছে যেন কী এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত। হুম!

চৌকিদাররা ডোলটাকে সশব্দে টানতে টানতে উঠানের মাঝখানে নিয়ে এল। জয়ন্ত সেদিকে ফিরেও তাকালে না।

দারোগাবাবু বললেন, "ও মশাই, বলি আপনার হল কি? ডোলটাকে ভালো করে দেখবেন বললেন না? তবে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে কী দেখছেন? ডোল তো আর ওখানে নেই।...আরে, আরে, ও আবার কী!" তাঁর দুই চক্ষু ছানাবড়ার মত হয়ে উঠল চরম বিস্ময়ে!

সুন্দরবাবু দুই পদ অগ্রসর হয়ে কেবলমাত্র বললেন, "হুম, হুম!"

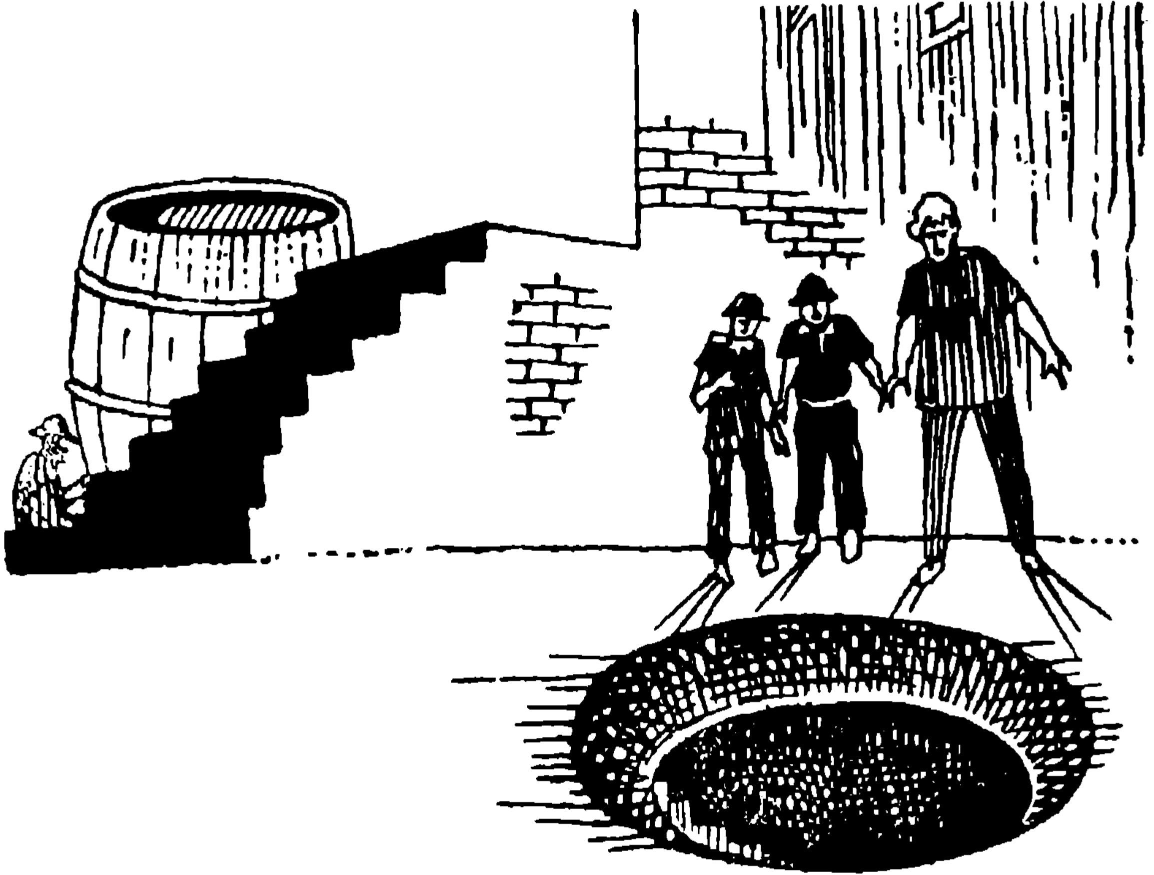
ঠোঁট টিপে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে জয়ন্ত বললে, "দারোগাবাবু, সিঁড়ির তলায় ডোলটা যেখানে ছিল, সেখানে এটা কী দেখছেন তো?"

হাঁদারামের মতন মুখ করে দারোগা বললেন, 'একটা বড়ো গর্ত!"

- "খালি গর্ত নয়, গর্তের ভিতর দিকে নেমে গিয়েছে এক সার সিঁড়ি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "গুপ্তপথ।"

- "হ্যাঁ। যখনই দেখলুম সদর দরজা ভিতর বা বাহির থেকে বন্ধ থাকলেও বাড়ির লোকেরা ভিতরে বা বাহিরে আনাগোনা করতে পারে, তখনই আন্দাজ করলুম, এ-বাড়ির কোথাও-না-কোথাও গুপ্তপথের অস্তিত্ব আছে। তারপর শুনলুম চৌকিদারের অন্তিম উক্তি- 'ডোল' 'ডোল'! এও শোনা গেল, চৌকিদারের যেখানে মৃত্যু হয় তার পাশেই পাওয়া গিয়েছে একটা মস্ত ডোল। অবশ্য গুপ্তপথ পাওয়া যাবে যে ডোলের তলাতেই, তখনও পর্যন্ত সেটা আমি আন্দাজ করতে পারিনি। কিন্তু এটুকু আমি নিশ্চিতরূপেই বুঝেছিলুম যে এই ডোলটাকে অবহেলা করে উড়িয়ে না দিলে কোনও-না-কোনও মূল্যবান তথ্য প্রকাশ পাবেই। আমার ধারণা যে ভুল নয়, এটা কি এখন আপনি স্বীকার করেন দারোগাবাবু?"



কিন্তু দারোগার অবস্থা তখন অত্যন্ত কাহিল, তিনি করুণ চোখে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, নীরবে।

- "আরও একটা কথা আন্দাজ করতে পারছি। চৌকিদারের দেহ কেন এইখানে পাওয়া গিয়েছে। চোখের সামনে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একটা 'ট্রাজেডি'র শেষ দৃশ্য! বাড়ির পলাতক লোকগুলো বোধহয় জানত না, এখানে কোনও চৌকিদার মোতায়েন করা হয়েছে। কিংবা জেনেও, বিশেষ কোনও প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই তারা আবার এই বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল গুপ্তদ্বার দিয়ে। চৌকিদার তাদের দেখতে পায়! তারা পলায়ন করে। চৌকিদার তাদের পিছনে পিছনে এখান পর্যন্ত ছুটে আসে। পাছে সমস্ত গুপ্তকথা ব্যক্ত হয়ে যায় সেই ভয়ে তারা তখন চৌকিদারকে করে মারাত্মক আক্রমণ! তারপর গুপ্তপথে নেমে ডোলটাকে আবার যথাস্থানে বসিয়ে সরে পড়ে সকলে মিলে। আর একটা বিষয় লক্ষ করুন! অত বড়ো ডোলে জল আছে মাত্র ইঞ্চি পাঁচেক। অতটুকু জল না রাখলেই চলত, তবু রাখা হয়েছে কেবল দুটি কারণে। প্রথমত জল থাকলে বাইরের কোনও অতি কৌতুহলী চক্ষু সন্দেহ করতে পারবে না যে, ডোলটা জলাধার ছাড়া অন্য কোনও কারণে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়ত অল্প জল না রাখলে ডোলটাকে নীচে থেকে ঠেলে সরাতে বা টেনে গর্তের মুখে আনতে বিশেষ বেগ পেতে হত। কিন্তু অতি চালাক লোকেরা অতি বোকা হয় প্রায়ই। অত বড়ো ডোলে অত কম জল-তাও পচা, পোকায়-ভরা আর অব্যবহার্য। একথা শুনেই আমার মন জাগ্রত হয়ে উঠেছিল এই সন্দেহে যে, ওই ডোলে জল রাখা হচ্ছে একটা লোক-দেখানো কাণ্ড! খুব সূক্ষ্ম সন্দেহ, না দারোগাবাবু? এরকম সন্দেহের নিশ্চয়ই কোনও মানে হয় না, কি বলেন?"

দারোগা দুই হাত জোড় করে বিনীতভাবে বললেন, "আমাকে আর লজ্জা দেবেন না জয়ন্তবাবু। আমি মাপ চাইছি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! জয়ন্তের কাছে যে শেষটা আপনাকে মাপ চাইতে হবে, এ আমি আগেই জানতুম। কিন্তু যাক সেকথা। এখন এই গুপ্তপথ নিয়ে কী করা যেতে পারে? হয়ত এই গুপ্ত পথের ভিতরে গেলে আশে-পাশে আমরা দেখতে পাব গুপ্তগৃহও, কী বলো জয়ন্ত?"

- "তা আমি জানি না।"

- "হয়তো কোনও গুপ্তগৃহের ভেতরে আমরা দেখতে পাব অপরাধীর দলকে। এখন আমাদের কী করা উচিত? সদলবলে গর্তের ভিতর গিয়ে নামব না কি?"

দারোগা বললেন, "সেইটেই উচিত বলে মনে হচ্ছে। আমরা সশস্ত্র, দলেও ভারী। অপরাধীদের গ্রেপ্তার করবার এমন সুয়োগ হয়তো আর পাব না। আপনার কী মত জয়ন্তবাবু?"

জয়ন্ত রিভলভার বার করে বললে, "সুড়ঙ্গের ভিতরে যে আমাদের নামাই উচিত, এ-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু সবাই প্রস্তুত রাখুন নিজের নিজের অস্ত্র।"

।। সপ্তম অধ্যায় ।।

সুড়ঙ্গ

সকলে সুড়ঙ্গ-পথের সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলেন। সর্বাগ্রে দারোগাবাবু।

কয়েকটা ধাপের পরেই সোজা পথ-অন্ধকার ও স্যাঁতসেতে।

টর্চের আলোতে অন্ধকার তাড়িয়ে প্রত্যেকেই যে-কোনও মুহূর্তে রিভলভারের ঘোড়া টেপবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল।

কেবল তাদের জুতোর শব্দগুলোই পাতালের স্তব্ধতা ভেঙে দিতে লাগল, তা ছাড়া অন্য কোনওরকম সন্দেহজনক শব্দ নেই।

এক জায়গায় একটা কুঠুরির মতো ঠাঁই পাওয়া গেল। তার তিন দিকে দেওয়াল, এক দিক খোলা। দরজা-টরজা কিছুই নেই এবং সেখানেও নেই জনপ্রাণীর চিহ্ন।

আরও খানিক এগুবার পর সুড়ঙ্গপথ শেষ হল। সেখানেও কয়েকটা ধাপ উঠে গিয়েছে উপর দিকে।

জয়ন্ত বললে, "বোঝা যাচ্ছে এই সুড়ঙ্গটা কেবল লুকিয়ে আনাগোনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সুড়ঙ্গের এই মুখটা ওরা বাইরের চোখের আড়ালে রেখেছে কেমন করে, সেইটেই এখন দ্রষ্টব্য।"

সে ধাপ দিয়ে উঠে গিয়ে উপর দিকে দুই হাত বাড়ালে হাতে ঠেকল ঠান্ডা ধাতুর স্পর্শ। কী এ? লোহার দরজা?

একটু জোর করে ঠেলা দিতেই গঙ্গাজলের 'সিস্টার্ন'-এর ডালার মতো একটা গোলাকার ভারী জিনিস উলটে বাইরের দিকে গিয়ে পড়ল। এবং সুড়ঙ্গের ভিতরে নেমে এল মুক্ত পৃথিবীর আলো।

সকলে সুড়ঙ্গ ছেড়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

হাত পনেরো-ষোলো চওড়া এবং হাত পঁচিশ-ছাব্বিশ লম্বা ঘাস-জমি, জঙ্গল ও কাঁটা-ঝোপে ঘেরা।

জয়ন্ত এক-মনে কিছুক্ষণ লোহার ঢাকনাখানা পরীক্ষা করে বললে, "চিত্তাকর্ষক বটে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "কী?"

- "এই ঢাকনাখানা। দেখুন, এটা একটা বড়ো পাত্রের মতো। এর ভিতরে মাটি ভরে ঘাস পুঁতে দেওয়া হয়েছে। এইবারে দেখুন!" সে ঢাকনাখানা আবার উলটে সুড়ঙ্গের মুখে স্থাপন করলে।

দারোগাবাবু বললেন, "বাঃ, আশপাশের ঘাসজমির সঙ্গে সুড়ঙ্গের মুখটা একেবারে মিলিয়ে গেল যে! একে তো চারিদিকের কাঁটা-ঝোপের ভয়ে এখানে বাইরের কারুর আনাগোনা নেই-তার উপরে চোখে ধুলো দেবার এই সহজ, কিন্তু চমৎকার ফন্দি! কেউ এখানে এলেও কিছুই সন্দেহ করতে পারবে না। আমরাও পারতুম না-যদি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে না আসতুম!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম!"

জয়ন্ত বললে, "সুড়ঙ্গের এক মুখে জলের ডোল আর এক মুখে ঘাস-মাটি ভরা ঢাকনা! দুই ই আছে প্রকাশ্য স্থানে, অথচ আসল রহস্য প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা কত অল্প!"

সুন্দরবাবু বললেন, "এত অনায়াসে যে চোখ ঠকাতে পারে, আমি তাকে মস্ত বড়ো ওস্তাদ বলে মানতে রাজি আছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, কে সে?"

জয়ন্ত বললে, "নিশ্চয়ই প্রতাপ চৌধুরি!"

দারোগাবাবু বললেন, "কিন্তু তার আর নাগাল পাওয়া সহজ নয়। আপনাদেরই মুখে শুনলুম, মানিকচাঁদের কাছে বাড়ি বেচে সে এখান থেকে চলে গিয়েছে।"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "মানিকচাঁদের কথা তখনও আমি বিশ্বাস করিনি, আর এখন বিশ্বাস না করবার মতো একটা বড়ো সূত্রও পেয়েছি।"

- "সূত্র? কী সূত্র?"

- "এটা নতুন নয়, পুরানো। সেই ৯৯৯ স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট!"

- "মানে?"

- "ওই দেখুন। শৌখিন প্রতাপ চৌধুরি যে সিগারেট খায়, তারই একটি আধ-পোড়া নমুনা এখানকার ঘাসজমিকেও অলঙ্কৃত করেছে! সিগারেটটা যদিও এখন নিবে গিয়েছে কিন্তু ভাল করে দেখলেই বোঝা যায়, ওটা টাটকা। খুব সম্ভব কাল রাত্রেই ওটা শোভা পেয়েছিল প্রতাপ চৌধুরির মুখে। ওটা যদি বেশি দিন রোদে আর খোলা হাওয়ায় পড়ে থাকত, তাহলে ওর কাগজের উপরে পড়ত দাগ আর সোনালি অংশটার রংও যেত জ্বলে। হায় প্রতাপ চৌধুরি, তুমি এত বড়ো ধূর্ত, কিন্তু তুচ্ছ সিগারেট কিনা বারবার তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে? অবশ্য তোমার পক্ষেও বলবার কথা আছে। তুমি বলতে পারো,-"তোরা যে এত সহজে আমার এত সাধের সুড়ঙ্গ-রহস্য আবিষ্কার করে ফেলবি, সেটা স্বপ্নেও জানলে আমি কি এখানে দাঁড়িয়ে মনের সুখে সিগারেট টানবার চেষ্টা করতুম?" কিন্তু ওই তো মুশকিল প্রতাপ চৌধুরি, ওইখানেই তো মুশকিল! অতি ধূর্তরা সেয়ানাপনায় নিজেদের অদ্বিতীয় বলে মনে করে, আর শেষ পর্যন্ত সেই নির্বুদ্ধিতাই তাদের পক্ষে হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক! নয় কি দারোগাবাবু? আমি আপনার কাছে শিক্ষানবিস মাত্র, কিন্তু আমি কি ভুল বলছি?"

দারোগা লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, "নিজেকে শিক্ষানবিস বলে জাহির করে আর আমাকে আক্রমণ করবেন না জয়ন্তবাবু! আপনি যদি শিক্ষানবিস হন, আমাকে তাহলে মানতে হয় যে, আমি এখনও গোয়েন্দাগিরির অ-আ পর্যন্ত শিখিনি। যে ছোটো বক্তৃতাটি দিলেন তা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ; আর আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তিও আশ্চর্য! আপনি হয়তো আকাশের শূন্যতার ভিতর থেকেও আসামি আবিষ্কার করতে পারেন।"

জয়ন্ত হেসে ফেলে বললে, "না, অতটা পারি না! আমার ডানা নেই, আকাশের খবর রাখব কেমন করে?"

- "কিন্তু জয়ন্তবাবু, তবে মানিকচাঁদ কেন বলেছে যে প্রতাপ চৌধুরি এই বাড়ি বিক্রি করে স্থানান্তরে গিয়েছে?"

- "মানিকচাঁদ হচ্ছে প্রতাপের প্রধান সাকরেদ, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। প্রতাপ নিজে আড়ালে থেকে সুতো টেনে মানিকচাঁদের দলকে পুতলোবাজির পুতুলের মতো অভিনয় করাতে চায়। যদি দৈবগতিকে প্রতাপের সব ওস্তাদি ভেস্তে যায়, তা হলে ধরা পড়বে মানিকচাঁদ অ্যান্ড কোম্পানি, কিন্তু সে নিজে থাকবে একেবারে নিরাপদ ব্যবধানে!"

হঠাৎ সুন্দরবাবুর বিপুল ভুঁড়ি উঠল চমকে এবং তাঁর চক্ষে জাগল ত্রস্ততা। তিনি তাড়াতাড়ি জয়ন্তের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার কানে কানে বললেন, "জয়ন্ত, দ্যাখো, দ্যাখো!"

জয়ন্ত সহজভাবেই বললে, "দেখেছি সুন্দরবাবু! এই শত্রুপুরীতে এসে আমার চোখ ঘুরছে চতুর্দিকেই। দারোগাবাবু, খানিক তফাতেই একটা ঝোপ কী রকম দুলছে দেখুন। বড়োই সন্দেহজনক। বাতাসের জোর নেই, ঝোপ কেন দোলে?"

দারোগাবাবু সেই দিকে তাকালেন, ঝোপটা দুলতে দুলতে আবার স্থির হয়ে এল। বললেন, "মনে হচ্ছে, ওই ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে কেউ যেন আমাদের লক্ষ করছে!"

জয়ন্ত সায় দিয়ে বললে, "আমারও সেই সন্দেহ হচ্ছে।"

- "এখন কী করা উচিত?"

- "দারোগাবাবু, আপনারা হচ্ছেন সরকারের দুলাল, আইন আপনাদের হাত-ধরা। আমার কাছেও রিভলভার আছে বটে, কিন্তু সহসা গুলিবৃষ্টি করলে হয়ত সরকারের আইন এই শখের গোয়েন্দাকে ক্ষমা করবে না। আপনার উচিত ওই সন্দেহজনক ঝোপটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো। তারপর নরহত্যা হলেও একটা ওজর দেখিয়ে আপনি হয়তো আইনের নাগপাশকে ফাঁকি দিতে পারবেন অনায়াসেই!"

দারোগাবাবু বললেন, "ব্যাপারটা অত সহজ নয় মশাই! আর কি সে দিন আছে? এখন একটু এদিক-ওদিক হলেই সারা দেশ জুড়ে খবরের কাগজওয়ালারা শেয়ালের মতো এক-স্বরে কী রকম 'ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া' করে চ্যাঁচাতে থাকে তা কি আপনি জানেন না?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "সব জানি। কিন্তু এটা কি আপনি বুঝছেন না, ওই ঝোপের আড়ালে যে আছে সে হয়তো এখন নিষ্পন্দ হয়ে আমাদেরই পানে বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করছে?"

সুন্দরবাবু চমকে উঠে পায়ে পায়ে পিছিয়ে আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে অদৃশ্য হবার চেষ্টা করলেন। যতদূর সম্ভব চুপি চুপি বললেন, "পালিয়ে এসো জয়ন্ত, তুমিও পালিয়ে এসো!"

দারোগাবাবু ম্রিয়মাণের মতো বাধো-বাধো গলায় বললেন, "তাহলে রিভলভার ছুড়ব নাকি?"

জয়ন্ত বললে, "নিশ্চয়! আপনি বাঁচলে বাপের নাম, জানেন না?"

সেই বিশেষ ঝোপটির দিকে লক্ষ্য করে দারোগাবাবু রিভলভার তুলে ঘোড়া টিপে দিলেন।



রিভলভার গর্জন করতেই ঝোপের ভিতর থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এল মানুষ নয়, একটা শুকর! পরমুহূর্তেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে সে আর একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে চোখের আড়ালে সরে পড়ল।



জয়ন্ত সকৌতুকে হাসতে হাসতে বললে, "মাভৈঃ, মাভৈঃ! শুয়োরটা যখন ওই ঝোপের ভেতর ঢোকে তখনই তাকে আমি দেখতে পেয়েছিলুম। আমি জানতুম, ওখানে মানুষ-জাতীয় কোনও শত্রুই নেই।"

দারোগাবাবু খাপের ভিতর রিভলভার পুরতে পুরতে অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, "তাহলে আমাদের মিছে ভয় দেখাবার জন্যে আপনি এতক্ষণ মশকরা করছিলেন?"

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "হুম। জয়ন্তও মানিকের দলে ভিড়ল? আমাদের নিয়ে তামাশা? নাঃ, এ অসহনীয়।"

জয়ন্ত আরও জোরে হেসে উঠে বললে, "মানিক যে আজ আমার সঙ্গে নেই সুন্দরবাবু! তাই আমি তারই অভাব পূরণের জন্যে মানিকের ভূমিকায় অভিনয় করার চেষ্টা করছি! কিন্তু যাক সে কথা। এখানে আর দেরি করে লাভ নেই। প্রতাপ চৌধুরি আর তার দলবল আজ বোধ করি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবে না। চলুন, আমরাও যবনিকার অন্তরালে প্রস্থান করি। ...হ্যাঁ, ভালো কথা। দারোগাবাবু, সুড়ঙ্গের দুই মুখ যেমন ছিল, সেইভাবেই বন্ধ করে যেতে ভুলবেন না যেন।"

- "কেন?"

- "শত্রুরা যেন সন্দেহ করতে না পারে হে, আমরা তাদের সব গুপ্তকথা জানতে পেরেছি।"

- "আপনি কি মনে করেন নরহত্যার পরেও তারা আবার এখানে আসতে সাহস করবে?"

- "না করাই তো উচিত। তবু সাবধানের মার নেই।"

রাস্তায় বেরিয়ে জয়ন্ত বললে, "দেখুন সুন্দরবাবু, ওই প্রতাপ চৌধুরির কথা ভুলে গিয়ে আমাদের এখন কাজ করতে হবে ভূষোপাগলা কে নিয়ে।"

দারোগাবাবু বললেন, "বিলক্ষণ! এত বড়ো একটা খুনের মামলা ভূলে যাব? যা তা খুন নয়, পুলিশ খুন!"

জয়ন্ত বললে, "খুনের মামলা নিয়ে মস্তক ঘর্মাক্ত করতে হবে -আপনাকেই। কোনও খুনের মামলা তদারক করবার জন্যে আমরা এ গ্রামে আসিনি।"

দারোগাবাবু বিষন্ন মুখে বললেন, "তাহলে আপনারা আমাকে আর সাহায্য করবেন না?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "নিশ্চয়ই করব। আগে আমার সব কথা শুনুন। আমরা এখানে এসেছি সুব্রতবাবুর অনুরোধে। তিনি আমাদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন এক রহস্যময় মামলা। তার কথা এখানে বলবার দরকার নেই, তবে এইটুকু জেনে রাখুন, তার সঙ্গেও জড়িত আছে ওই প্রতাপ চৌধুরি। সুতরাং আসলে প্রতাপ চৌধুরিকে আমরা ছাড়ব না, আর সেও বোধহয় আমাদের ছাড়বে না-আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তুমি ভূষোপাগলার কথা কী বলছিলে জয়ন্ত?"

- "এইবারে ভূষোপাগলাকেই আমাদের দরকার।"

- "একটা বাজে পাগলার জন্যে হঠাৎ তোমার টনক নড়ল কেন?"

- "এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন।"

- "কী?"

- "ভূষোপাগলা বরাবরই সোনার আনারসের ছড়া চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে করতে এখানকার হাটে-ঘাটে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। এত দিন কেউ তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনেনি। কিন্তু প্রতাপ চৌধুরি আজ হঠাৎ তাকে বন্দি করতে চায় কেন?"

সুন্দরবাবু কোনও জবাব না দিয়ে কেবল মাথার টাক চুলকোতে লাগলেন।

জয়ন্ত বললে, "কেন, তা বুঝতে পারছেন না? প্রতাপের সন্দেহ হয়েছে যে, ভূষো সোনার আনারসের গুপ্তকথা কিছু কিছু জানে।"

- "প্রতাপ তো এখানকারই লোক। এত দিন তার এ সন্দেহ হয়নি কেন?"

- "এতদিন সে সোনার আনারস নিয়ে মাথা ঘামাবার চেষ্টাও করেনি। এ-সম্বন্ধে সে হঠাৎ সজাগ হয়েই আগে দিয়েছে সুব্রতবাবুর উপরে হানা। তারপরেই তার দৃষ্টি পড়েছে ভূষোপাগলার উপরে। বুঝেছেন?"

- "হুম। জয়ন্ত তোমার অনুমানই সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে।"

- "তাই আমাদেরও ওই ভূষোপাগলাকে ছাড়লে চলবেনা।তার সঙ্গে কথা কয়ে আমার এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে, সোনার আনারসের অনেক গুপ্তকথাই সে জানে। সৌভাগ্যক্রমে সে আছে এখন আমাদেরই হাতে। তার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করে দেখা যাক, আমার সন্দেহ সত্য কি না।"

বাসায় ফিরে এসে দেখা গেল, মানিক বিছানার উপরে বসে সুব্রতর সঙ্গে গল্প করছে।

জয়ন্ত বললে, "কী হে মানিক, এখন কেমন আছ?"

মানিক মুখ ভার করে বললে, "যাও, যাও!"

জয়ন্ত হেসে তাঁর পিঠে হাত বলোতে বুলোতে বললে, "সঙ্গে নিয়ে যাইনি বলে অভিমান হয়েছে? তোমার শরীরের অবস্থা দেখেই নিয়ে যাইনি ভাই, আমার উপর অবিচার কোরো না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! তুমি সঙ্গে ছিলে না, বেঁচেছিলুম। অন্তত খানিকক্ষণ তোমার বাক্য-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলুম।"

মানিক ফিক করে হেসে ফেলে বললে, "তাহলে বাক্য-যন্ত্রণা আবার শুরু হবে নাকি?"

জয়ন্ত বললে, "না মানিক, আজকের মতো সুন্দরবাবুকে ক্ষমা করো! সুব্রতবাবু, ভূষোপাগলা কেমন আছে?"

মানিক বললে, "নিশ্চয়ই ভালো আছে। এই তো পাঁচ মিনিট আগেও সে চিৎকার করে সোনার আনারসের ছড়া আউড়ে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছিল।"

জয়ন্ত একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, "সুব্রতবাবু, দয়া করে ভূষোকে একবার এখানে নিয়ে আসতে পারবেন কি?"

"যাচ্ছি" বলে সুব্রত ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে সুব্রত ফিরে এসে বললে, “ভূষোকে দেখতে পেলুম না।”

জয়ন্ত চমকে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, “মানে?”

- “ভূষো ঘরেও নেই, এই বাড়ির ভিতরেও কোথাও নেই। কেবল তার ঘরের দেওয়ালে কাঠ-কয়লা দিয়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে- “সোনার আনারস! সোনার আনারস! আমি চললুম সেই সোনার আনারসের সন্ধানে!”

।। অষ্টম অধ্যায় ।।

জলগ টিকটিকি

গভীর রাত্রে জয়ন্ত হঠাৎ ধাক্কা মেরে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে মানিকের।

মানিক ধড়মড় করে বিছানার উপরে উঠে বসে বললে, “ব্যাপার কি জয়? আবার কোনও বিপদ ঘটল নাকি?”

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, “বিপদ নয় মানিক, বিপদ নয়। শোনো-”

শোনা গেল, খানিক দূর থেকে কে আবৃত্তি করছে-

‘আয়নাতে ওই মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোটকা জট।’

মানিক বললে, “ওই তো পলাতক ভূষোপাগলার গলা।”

জয়ন্ত বললে, “হ্যাঁ, ভূষো যে এখানকার মাটি ছেড়ে নড়তে পারবে না, সেটা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলুম। মানিক, তোমার শরীর এখন সুস্থ হয়েছে?”

- “হ্যাঁ। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?”

- “খুব সম্ভব ভূষো বাগানের পুকুরপাড়েই আছে। আমি চুপি চুপি গিয়ে দেখতে চাই সেখানে সে কী করছে। তুমিও কি আমার সঙ্গে আসবে?”

এক লাফে নীচে নেমে মানিক বললে, “সে কথা আবার বলতে।”

আকাশে একাদশীর চাঁদ। রাত্রেও মানুষের দৃষ্টি অচল নয়।

জয়ন্তের অনুমান সত্য। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে বটগাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল একটা মানুষের মূর্তি। নিশ্চয়ই ভূষোপাগলা।

মিনিট-কয়েক সে নীরবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বটগাছের পশ্চিমদিক ধরে হনহন করে এগিয়ে যেতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, “আজ আর ভূষোর সঙ্গ ছাড়া হবে না। ও কোথায় যায়, দেখবার জন্যে আমার আগ্রহ হচ্ছে।”

- “কেন বলো দেখি?”

- “আমি ভূষোকে সাধারণ পাগল বলে মনে করি না। আমার বিশ্বাস, ও অকারণে পাগলামির ঝোঁকে ওদিকে যাচ্ছে না, ওর ওই পথ-চলার ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।”

- “জয়ন্ত, তোমার এই সন্দেহের কারণ আমি বুঝতে পারছি না।”

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। খানিকক্ষণ কেটে গেল।

মানিক বললে, “আমরা বোধহয় আধ ঘণ্টা ধরে পথ চলছি। এইভাবেই আজকের রাতটা পুইয়ে যাবে না কি?”

জয়ন্ত বললে, “যেতে পারে। মানিক একটা বিষয় লক্ষ করেছ?”

- “কী?”

- “ভূষো মাঠ ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু একবারও বাঁয়ে কী ডাইনে ফিরছে না, সুব্রতবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে অগ্রসর হয়েছে একেবারে সোজাসুজি।”

- “তার দ্বারা কী প্রমাণিত হয়?”

- “একটু পরেই বুঝতে পারব।”

আরও খানিকক্ষণ গেল। মানিক বললে, “ক্ষ্যাপার পাল্লায় পড়ে আমরাও ক্ষেপে গেলুম নাকি?”

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, “না মানিক, না। ওই দ্যাখো, ভূষো দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা আজ এক ক্রোশ পথ পার হয়েছি।”

- "এতটা নিশ্চিত হলে কেমন করে?"

- "কারণ ভূষোপাগলা এইখানে এসে থেমেছে।"

- "এ কী রকম হেয়ালি?"

- "হেঁয়ালি নয় হে, হেঁয়ালি নয়! হেঁয়ালির ভিতরে আমি পেয়েছি অর্থের সন্ধান! দ্যাখো, দ্যাখো, ভূষোর রকম দ্যাখো !"

ভূষো এইবারে সত্য-সত্যই পাগলের মতো চারিদিকে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল-পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে!

মানিক একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে সবিস্ময়ে বললে, "ভূষোর হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ও যেন কী খুঁজছে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না!"

- "কিন্তু কী খুঁজছে?"

- "ভগবান জানেন। হয়তো পাগলটা ভেবেছিল এখানেই ফলে সোনার আনারস!"

- "আমিও তো ওই রকমই একটা অসম্ভব আশা করেছিলুম।"

- "যাও, যাও, বাজে বোকো না!"

- "বাজে নয়, সত্যি বলছি। আমার দৃঢ় ধারণা, সুব্রতবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভূষো প্রায়ই এই পর্যন্ত আসে। কিন্তু যা পাবার আশায় এত দূর আসে, তা আর খুঁজে পায় না। ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর! কিন্তু কোথায় পরশপাথর? সেই দুঃখেই বোধহয় ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

মানিক একটু ভেবে বললে, "কিন্তু কথা হচ্ছে, ভূষো এতখানি পথ পার হয়ে ঠিক এইখানেই বা এসে থামল কেন?"

মানিকের পিঠ চাপড়ে জয়ন্ত বললে, "ঠিকই বলেছ। তোমার এই প্রশ্ন হচ্ছে একটা প্রশ্নের মতো প্রশ্ন। এবারে ওই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।"

- "কার কাছে উত্তর খুঁজবে? ভূষোকে কিছু জিজ্ঞাসা করা মিছে, কারণ নিজেই সে কোনও উত্তর খুঁজে পায়নি।"

- "ভায়া, উত্তর খুঁজব আমার নিজের মনের ভিতরেই। ভূষোর মুখ চেয়ে তো আমরা এখানে আসিনি।"

হঠাৎ ছুটোছুটি থামিয়ে ভূষো দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে আউড়ে গেল-

পশ্চিমাতে পঞ্চ পোয়া,
সূয্যিমামার ঝিকিমিকি,
নায়ের পরে যায় কত না,
খেলছে জলগ টিকটিকি। -

হায় রে হায়, সব গুলিয়ে গেল, সব গুলিয়ে গেল। ওরে বাবা জলগ টিকটিকি, কোথায় আছিস তুই, কে তোকে তাড়িয়ে দিলে বাপধন?"

ঠিক সেই সময়ে কাছের একটা ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল আর এক মনুষ্যমূর্তি। সে খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে পিছন থেকে ভূষোর দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, "প্রশান্ত চৌধুরির চর এখনও ভূষোর পেছনে লেগে আছে? নিশ্চয়ই ওকে আবার ধরে নিয়ে যেতে চায়। চলো মানিক, আমরাই ওকে গ্রেপ্তার করি!"



জয়ন্ত ও মানিক গাছের আড়াল ছেড়ে বেগে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু লোকটা যেমন সাবধানি, তেমনি চটপটে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তাদের দেখে ফেললে। পর-মুহূর্তেই সে একটা জঙ্গলের দিকে দৌড় মারলে তিরের মতো!

তার পা লক্ষ্য করে জয়ন্ত ছুড়লে রিভলভার। কিন্তু রাত্রের ঝাপসা আলোয় লক্ষ্যভেদ করতে পারলে না। লোকটা জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হল।

জয়ন্ত ও মানিক জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল, কিন্তু পলাতকের কোনও পাত্তাই মিলল না। দেখলে খালি চাঁদের আলোর ফিতে দিয়ে গাঁথা অন্ধকারকে।

তারা বাইরে বেরিয়ে এল। সেখানে ভূষোপাগলাকেও দেখতে পেলে না।

মানিক বললে, "পাগলা ভয় পেয়ে আবার পালিয়েছে। এখন কী করবে?"

- "অতঃপর ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরব। তারপর ঘুমিয়ে পড়ব। তারপর সকালে উঠে সুব্রতবাবুকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। তারপর সদলবলে আবার এখানে আগমন করব।"

- "আবার এখানে আসবে?"

- "নিশ্চয়, নিশ্চয়!"

- "কেন?"

- "জলগ টিকটিকি প্রভৃতি আরও অনেক কিছুর সন্ধানে।"

- "ভূষোর সঙ্গে তুমিও টিকটিকি নিয়ে মাথা ঘামাতে চাও না কি?"

- "মাথা না ঘামিয়ে উপায় নেই!"

- "বুঝেছি জয়! তুমি একটা কোনও হদিস পেয়েছ।"

- "রহস্যের সিংহদ্বার খোলবার জন্যে একটা চাবিকাঠি কুড়িয়ে পেয়েছি। কিন্তু অনেক কালের পুরানো মরচেপড়া চাবি, এখনও কুলুপে ভালো করে লাগছে না। অপূর্ব এই সোনার আনারসের ছড়া! এর প্রত্যেক কথাটির অর্থ যে-কোনও শ্রেষ্ঠ কবিতার চেয়েও গভীর। কিন্তু জেনে রেখো, এ মামলার কিনারা হতে দেরি নেই।"

।। নবম অধ্যায় ।।

মড়া নদীর শুকনো খাত

প্রভাত। জানলার বাইরে দুলছে নতুন রোদের স্বচ্ছ সোনার আঁচল এবং তারই ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে সবুজের দোলনায় দুলদুলে ফলশিশুদের হাসি-রঙিন মিষ্ট মুখগুলি।

প্রভাতী চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিয়েই জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা সুব্রতবাবু, "এদেশে কখনও বাঘরাজা বলে কেউ ছিলেন কি ?"

সুব্রত বললে, "বাঘরাজা.....বাঘরাজা? হ্যাঁ, বাবার মুখে শুনেছি, অনেক কাল আগে এ-অঞ্চলে এক প্রতাপশালী রাজবংশ ছিল, তাদের উপাধি 'বাঘ'।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! বাঘ আবার মানুষের উপাধি হয় নাকি?"

জয়ন্ত বললে, "হয়, সুন্দরবাবু হয়। আমার পরিচিতদের মধ্যেই "বাঘ" উপাধিধারী লোক আছেন। হয়তো তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ একাই কোনও ব্যাঘ্র বধ করেছিলেন, আর তার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে লোকে তাঁকে দিয়েছিল ওই উপাধি। পরে তার বংশধররাও ওই 'বাঘ' বলেই পরিচিত হয়। কেবল 'বাঘ' নয়, বাংলাদেশে 'হাতি' উপাধিধারী লোকও আছে। কিন্তু যাক ও-কথা। সুব্রতবাবু আপনার কথায় আমার কৌতূহল প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। আপনি ওই বাঘরাজাদের সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারেন কি?"

সুব্রত বললে, "আমি বিশেষ কিছুই জানি না, আর আমার পক্ষে জানবার কথাও নয়। কারণ বাঘরাজাদের বংশ নাকি পলাশির যুদ্ধের আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে শুনেছি, আমার প্রপিতামহেরও আগে আমাদেরই কোনও পূর্বপুরুষ কোনও এক বাঘরাজার দেওয়ানের পদ লাভ করেছিলেন।"

- "বাঘরাজাদের কোনও চিহ্নই কি এ-অঞ্চলে বর্তমান নেই?"

- "কিছু না। আমার পিতামহ বলতেন, যেখানে বাঘরাজাদের রাজধানী ছিল, এখন সেখানে বিরাজ করছে নিবিড় জঙ্গল।"

- "সে জায়গাটা কোথায়?"

- "তাও আমি জানি না।"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা সুব্রতবাবু, আপনাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে কোনও নদী-টদী আছে কি?"

- "কেন বলুন দেখি?"

- "আমি এই রকম একটি নদী খুঁজছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না।"

সুব্রত একটু বিস্মিত স্বরে বললে, "জয়ন্তবাবু, আপনার প্রত্যেক প্রশ্নই কেমন রহস্যময়। হঠাৎ নদীর কথা কেন আপনার মনে উঠল?"

- "সেকথা পরে বলব। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।"

- "না, আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে কোনও নদী নেই।"

জয়ন্ত হতাশভাবে বললে, "নেই! তাহলে কি আমি মিছাই এত জল্পনা-কল্পনা করে মরলুম? সোনার আনারসের ছড়াটা কি একেবারেই বাজে?"

সুব্রত প্রায় আধ মিনিট ধরে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইল বিস্ময়চকিত চোখে। তারপর থেমে থেমে বললে, "সোনার আনারসের ছড়া? তার সঙ্গে নদীর সম্পর্ক কী?"

- "সম্পর্ক একটা আছে বলেই অনুমান করেছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি আমার অনুমান সত্য নয়।"

সুব্রত বললে, "দেখুন জয়ন্তবাবু, আমাদের গ্রাম থেকে কিছু দূরে আগে একটা নদী ছিল বটে।"

জয়ন্ত অত্যন্ত উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠল, "ছিল নাকি?"

- "আজ্ঞে হ্যাঁ। এ অঞ্চলে আগে একটা নদী ছিল, কিন্তু এখন সেটা শুকিয়ে গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে দেখা যায় তার শুকনো খাত।"

- "তারপর, তারপর?"

- "এখনও বর্ষাকালে সেই খাত কিছুদিনের জন্যে জলে ভরে যায়। কিন্তু সেটা তো গ্রামের পশ্চিমে নয়-এখান থেকে উত্তর-পশ্চিমদিকে মাইল তিন কী আরও কিছু বেশি পথ পেরিয়ে গেলে তবে সেই খাতটা পাওয়া যায়।"

জয়ন্ত যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, "উত্তর-পশ্চিমদিকে। তাহলে আবার যে আমার হিসাব গুলিয়ে যাচ্ছে!" অল্পক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বললে, "সুব্রতবাবু, যদিও আমি খেই খুঁজে পাচ্ছি না, তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই।"

- "মানে?"

- "সেই মরা নদীর শুকনো খাতটা স্বচক্ষে একবার দর্শন করব। এখনই চলুন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "আরে ধ্যেৎ! খামখেয়ালের একটা মাত্রা থাকা উচিত। কোনও মরা নদীর শুকনো খাত দেখে আমাদের কী ইষ্টলাভ হবে? তার চেয়ে সুব্রতবাবু যদি

আরও এক পেয়ালা চা, আরও এক প্লেট চিঁড়ে-আলুভাজা আর বেগুনি-ফুলুরির ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে সেটা হবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।"

জয়ন্ত ফিরে বললে, "মানিক, তোমারও কি এই মত?"

মানিক এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে জয়ন্ত ও সুব্রতের কথাবার্তা শ্রবণ করছিল। সে মুখ তুলে বললে, "ভাই জয়ন্ত, তোমাদের কথা শোনবার পর আমিও গভীর আঁধারে যেন কিঞ্চিৎ আলোর ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি! হুঁ, 'নায়ের পরে যায় কত না, খেলছে জলগ টিকটিকি!' এটি একটি মূল্যবান সঙ্কেত। কিন্তু 'পশ্চিমাতে পঞ্চ পোয়া, সূয্যিমামার ঝিকমিকি'-এ লাইনটির কোনওই সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছি না যে!"

- "আগে তো উত্তর-পশ্চিমদিকে যাত্রা করা যাক, তারপর দেখা যাবে কত ধানে কত চাল।"

- "উত্তম। আমি প্রস্তুত। সুন্দরবাবু আপাতত চা এবং চিঁড়ে, আলুভাজা এবং বেগুনি-ফুলুরি নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, আমরা ততক্ষণে খানিকটা 'মর্নিং ওয়াক' করে আসি।"

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন , "আমি যদি এখনই তোমাদের সঙ্গে এই চায়ের আসর ত্যাগ না করি, তাহলে এর পরে মানিকের দুষ্ট জিহ্বা যে কতখানি অসংযত হয়ে উঠবে, তা কী আমি জানি না? হুম, আমি আর চা-টা খেতে চাই না, আমিও সকলের সঙ্গে যেতে চাই।"

ইতিমধ্যে দারোগাবাবু এসে হাজির। জয়ন্ত দলে টেনে নিলে তাকেও।

।। দশম অধ্যায় ।।

রহস্যের চাবিকাঠি

সুব্রত বললে, "এই সেই মরা নদীর শুকনো খাত।"

জয়ন্ত বললে, সরস্বতী নদীও শুকিয়ে গিয়ে বাংলাদেশের নানা জায়গায় ঠিক এই রকমই খাত সৃষ্টি করেছে। এই মরা নদীটাও দেখছি আকারে আগে সরস্বতীর মতোই ছিল।"

খাতটা চওড়ায় কলকাতার আদিগঙ্গার চেয়ে বড়ো হবে না। দক্ষিণ থেকে বরাবর উত্তর দিকে চলে গিয়েছে। খাতটা মাঝে মাঝে ভরাট হয়ে আছে এবং তার উপরে দেখা যাচ্ছে ছোটো-বড়ো ঝোপ-ঝাপ ও জঙ্গল।

দক্ষিণদিকে খাতটা যেখানে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে নীরবে কী ভাবতে লাগল জয়ন্ত। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "মানিক, খাতটা অর্থাৎ নদীটা বোধহয় দক্ষিণ দিকেও এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা আর দেখা যাচ্ছে না; কারণ, তা একেবারে ভরাট হয়ে সমতল মাঠের সঙ্গে মিলিয়ে আছে।"

মানিক বললে, "তোমার এ অনুমান অসঙ্গত নয়।"

দারোগাবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "একটা খাত নিয়ে এমন গভীর গবেষণার কারণ কী বুঝছি না।"

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "আমারও ওই মত। আমি বাসায় ফিরে যেতে চাই।"

সুব্রতও বললে, "জয়ন্তবাবু, আপনার কী উদ্দেশ্য বলুন দেখি?"

জয়ন্ত কারুর কোনও কথার জবাব না দিয়েই হঠাৎ উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠল, "হয়েছে মানিক, হয়েছে! আমি চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছি!"

দারোগাবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "চাবিকাঠি? কিসের চাবিকাঠি মশাই?"

- "রহস্যের।"

- "রহস্য আবার কী?"

- "যদি জানতে চান, আমার সঙ্গে আসুন। এসো মানিক।" জয়ন্ত দ্রুতপদে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হতে লাগল।

সুন্দরবাবু খানিকটা এগিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "ও জয়ন্ত, একটু আস্তে চলো ভাই, তোমার সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে পারব কেন-আমার বপুখানি দেখছ তো?"

জয়ন্ত গতিও কমালে না, উত্তরও দিলে না-সমানে এগিয়ে চলল।

দারোগাবাবু বললেন, "এ যেন বুনো হাঁসের পিছনে ছোটা হচ্ছে।"

সুব্রত বললে, "সোনার আনারসের ভিতরে যে ছড়াটা ছিল, জয়ন্তবাবু বোধহয় তার মানে খুঁজে পেয়েছেন।"

দারোগাবাবু তপ্তস্বরে বললেন, "ওই ছড়াটার কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ভূষো হচ্ছে আস্ত পাগল, একটা বাজে ছেলেভুলোনো ছড়া নিয়ে তার সঙ্গে মেতে থাকা আমাদের কি শোভা পায়? ছড়া হচ্ছে ছড়া। তার মধ্যে কোনও অর্থই থাকে না।"

সুব্রত বললে, "আমারও তো ওই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু জয়ন্তবাবুর বিশ্বাস অন্য রকম।"

- "নিজের বিশ্বাস নিয়ে নিজেই থাকুন, কিন্তু তিনি আমাদের নিয়ে টানাটানি করছেন কেন? ঘাড়ে পড়েছে খুনের মামলা, এখন তার কিনারা করব, না ছড়ার অর্থ খুঁজে মরব? আরে ছিঃ, এ যে দস্তুরমতো ছেলেমানুষি!"

আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে জয়ন্ত বলে, "মানিক, কাল রাত্রে ভূষো ঠিক এইখানে এসেই চারদিকে ছুটোছুটি করেছিল না?"

মানিক এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বললে, "হ্যা জয়ন্ত।"

- "পূর্ব-দক্ষিণদিকে তাকিয়ে দ্যাখো।"

- "ওদিকে তো দেখছি মাঠের পরে রয়েছে একটা নিবিড় অরণ্য।"

- "সোনার আনারসের জয় হোক। এইবারে আমরা ওই বনের ভিতরে প্রবেশ করব। পূর্ব-দক্ষিণদিক ধরেই এগিয়ে চলব-কিন্তু তাড়াতাড়ি নয়, আমাদের পদচালনা করতে হবে স্বাভাবিকভাবেই। কতক্ষণ অগ্রসর হতে হবে জানো? ঠিক এক প্রহর।"

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বললে, "অর্থাৎ আরও তিন ঘণ্টা ধরে আমাদের বনে বনে ঘুরতে হবে। ওরে বাবা!"

দারোগাবাবু বললেন, "আরও তিন ঘণ্টা কী বলছেন মশাই? তিন ঘণ্টা লাগবে তো খালি এগিয়ে যেতেই, ফিরতেও তো লাগবে আরও তিন ঘণ্টা! তার মানে কোদালপুরে ফিরব আমার রাতের অন্ধকারে!"

- "হুম, তাই না কি? সারাদিন খালি তবে পথই হাঁটব, দানা-পানি কিছুই জুটবে না?"

- "তা ছাড়া আর কী?"

- "আমি কি পাগল? আমাকে কি ভীমরতিতে ধরেছে? আমি পারব না-ব্যাস আমার এক কথা।"

জয়ন্ত কোনও রকমে হাসি চেপে বললে, "ভয় নেই সুন্দরবাবু, আপনাকে উপোস করতে হবে না।"

- "উপোস করতে হবে না কী রকম? নিবিড় অরণ্যের মধ্যে হোটেল পাওয়া যায় নাকি?"

- "সুন্দরবাবু, আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। মানিকের কাঁধে ওই যে ব্যাগটি ঝুলছে, ওর ভেতরে খুঁজলে যৎকিঞ্চিৎ খাবার-টাবারও পাওয়া যেতে পারে।"

প্রবল মস্তক আন্দোলন করে সুন্দরবাবু বললেন, "ডবল খাবারের লোভেও আমি আর ছয়-সাত ঘণ্টা ধরে হাঁটতে পারব না। এখনই আমার জিভ বেরিয়ে পড়তে চাইছে-হুম!"

দারোগাবাবু বললে, "আমিও সুন্দরবাবুর দলে। আমি খুনের মামলার আসামি খুঁজছি-সোনার আনারসের ছড়া নিয়ে আমার কী লাভ হবে।"

জয়ন্ত বললে, "কী লাভ হবে? আপনি কি জানেন, ওই খুনের মামলার আসামি প্রতাপ চৌধুরির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো আছে এই সোনার আনারসের রহস্য?"

- "কী সেই রহস্য?"

- "যদি জানতে চান, আসুন আমার সঙ্গে। আমাদের আর অপেক্ষা করা চলবে না। প্রতাপ চৌধুরিও এই রহস্যের চাবিকাঠি খুঁজছে, কিন্তু আমরা কার্যোদ্ধার করতে চাই তার আগেই। আমার কথায় অবিশ্বাস করবেন না-আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ আপনারা দেখতে পাবেন একটা কল্পনাতীত দৃশ্য!"

।। একাদশ অধ্যায় ।।

মানিকের ব্যাগে অশ্বডিম্ব নেই

গহন বন তো গহন বন! অরণ্যের এমন নিবিড়তা কেউ কল্পনা করেনি। এত বুড়ো-বুড়ো গাছ খুব কম বনেই চোখে পড়ে-জন্মেছে তারা কোন মান্ধাতার আমলে,

তাও আন্দাজ করবার জো নেই। কোথাও কোথাও তারা পরস্পরকে এমন জড়াজড়ি করে আছে এবং তাদের উপর দিকটায় লতাপাতারা এমনভাবে ঘন জাল বুনে রেখেছে যে, দুপুরের রোদও ভিতরে প্রবেশ করবার পথ পায়নি বললেও চলে।

সর্বত্রই ঝোপ-ঝাপ, কাঁটা-জঙ্গল এবং মানুষের মাথা-ছাড়িয়ে-ওঠা আগাছার ভিড়। সেইগুলোকে ঠেলে ঠেলে কোনও রকমে পথ করে নিতে হয়। গায়ে পট-পট করে কাঁটা বেঁধে, আশেপাশে ফোঁস ফোঁস করে ভয়াবহ শব্দ শোনা যায়, মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে পথিকদের দেহ হয় পপাতধরণীতলে, কিন্তু তবু নির্বাপিত হল না জয়ন্তের উৎসাহবহ্নি!

সুন্দরবাবু মুখ ব্যাদান করে বিষম হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "দারোগাবাবু, ডানপিটে জয়ন্তটা আজ আমাদের শমন-সদনে প্রেরণ করতে চায় নাকি?"

রুদ্ধ ক্রোধে ফুলতে ফুলতে দারোগাবাবু বললেন, "জানি না। এমন চূড়ান্ত ক্ষ্যাপামি জীবনে আর কখনও দেখিনি।"

- "হুম! কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা কোথায় কোন দিকে যাচ্ছি?"

জয়ন্ত বললে, "আমরা যাচ্ছি পূর্ব-দক্ষিণদিকে।"

- "তাই নাকি? চোখে তো দেখছি খালি ঝোপ-ঝাপ আর অন্ধকার। এর মধ্যে এসে তুমি কি দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালোনি?"

- "উঁহু!"

- "কেমন করে জানলে?"

হাত তুলে একটা জিনিস দেখিয়ে জয়ন্ত বললে, "এই আমাদের পথ প্রদর্শক।"

- "কী ওটা হে? ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না।"

- "কম্পাস।"

- "কিন্তু পূর্ব-দক্ষিণদিকে ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধরে এগিয়ে তুমি কী পরমার্থ লাভ করবে?"

- "শুনলে বিশ্বাস করবেন না।"

- "বিশ্বাস করব না কী রকম?"

- "উঁহু, বিশ্বাস করবেন না।"

- “আলবৎ করব, হাজার বার করব। তোমার ল্যাজ ধরতে যখন বাধ্য হয়েছি, তখন সোনার পাথরবাটি দেখেও আমার আর অবিশ্বাস করবার উপায় নেই।”

- “সোনার পাথরবাটি তো একটা অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য। এ হচ্ছে তারও চেয়ে অবিশ্বাস্য।”

- “ও বাবা, তাই নাকি? শুনেই যে আক্কেল গুডুম হয়ে যাচ্ছে!”

- “তা যাবেই তো!”

- “অত প্যাঁচ কষছ কেন ভায়া? আসল ব্যাপারটা খুলেই বলো না!”

- “শুনবেন তাহলে?”

- “শুনব বলে তো উভয় কান খাড়া করে আছি। স্পষ্ট করে বলো, পথের শেষে গিয়ে তুমি কী দেখতে চাও?”

- “একটি প্রকাণ্ড অখণ্ডমণ্ডলাকার, দুগ্ধফেননিভ অশ্বডিম্ব।”

সুন্দরবাবু খানিকক্ষণ অতি গম্ভীরভাবে অগ্রসর হলেন। তারপর আহত কণ্ঠে বললেন, “জয়ন্ত, তুমিও?”

- “মানে?”

- “তুমিও আমার সঙ্গে বাজে ঠাট্টা শুরু করলে মানিকের মতো?”

- “ঠাট্টা নয় সুন্দরবাবু, ঠাট্টা নয়! পথের শেষে গিয়ে যে কী দেখব, তা নিজেই আমি জানি না। কে জানে, আমার সমস্ত জল্পনা-কল্পনা শেষটা অশ্বডিম্বের মতোই অলীক বলে প্রতিপন্ন হবে কিনা!”

দারোগাবাবু ঝাঁঝালো গলায় বললেন, "চমৎকার জয়ন্তবাবু, চমৎকার! তাহলে আপনি আমাদের এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করাতে চান কেবল কাদা ঘেঁটে ফিরে আসবার জন্যে?”

জয়ন্ত ঠোঁট টিপে একটুখানি হাসলে, কোনও জবাব দেওয়ার দরকার মনে করলে না।

দারোগাবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করে ডাকলেন, “সুন্দরবাবু!”

- “হুম, হুম! বড্ড রেগেছেন দেখছি।”

- “হ্যাঁ, তাই।”

- “কিন্তু-”

- "এখন আর কিন্তু-টিন্তু নেই।"

- "তবে?"

- "আপনি আর আমি দুজনেই পুলিশের লোক।"

- "বলাই বাহুল্য।"

- "আমরা হচ্ছি কাজের মানুষ!"

- "অত্যন্ত!"

- "আমরা কী পাগলের মতো, গাধার মতো, অন্ধের মতো অশ্বডিম্বের পিছনে ছুটতে পারি?"

- "হুম, হুম, কিছুতেই না!"

মানিক এইবারে মুখ খুললে। বলবে "এ কথা আপনি কী করে জানলেন দারোগাবাবু?"

- "কী কথা?"

- "গাধারা আর পাগলরা আর অন্ধেরা অশ্বডিম্বের পশ্চাতে ধাবমান হয়?"

- "মানিকবাবু, আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। সুন্দরবাবু!"

- "উঁ।"

- "আমাদের এখন কী করা উচিত জানেন?"

- "মোটেই জানি না।"

- "আমাদের এখন উচিত, এইখান থেকেই ধুলো-পায়ে বিদায় নেওয়া।"

- "অর্থাৎ আবার কোদালপুরে ফিরে যাওয়া?"

দারোগাবাবুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সুন্দরবাবু করলেন একবার জয়ন্তের এবং আর একবার মানিকের মুখের উপরে দৃষ্টিপাত। তারপর মাথা নেড়ে করুণ সুরে বললে, "হুম, অসম্ভব!"

- "কী অসম্ভব?

- "এখন কোদালপুরে ফিরে যাওয়া।"

- "কেন?"

- "জয়ন্তের পাগলামি আর মানিকের দুষ্ট রসনাকে আমি সমর্থন করি না বটে, কিন্তু বোধহয় ওদের আমি কিছু কিছু-ওর নাম কী-ভালোবাসি। আমার পক্ষে ওদের

ছেড়ে চলে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। নিতান্তই যদি যেতে চান, তাহলে আপনাকে যেতে হবে একলাই।”

দারোগাবাবুর দুই চক্ষে ফুটল তীব্র ভাব। কিন্তু তিনি আর দ্বিরুক্তি না করে অগ্রসর হতে লাগলেন সকলের পিছনে পিছনে। বোধ করি তিনি বুঝতে পারলেন যে, একলা এই বন থেকে বেরুবার চেষ্টা করলে পথ হারাবার সম্ভাবনাই হবে বেশি।

জয়ন্ত নিজের হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, “আমরা প্রায় পথের শেষে এসে পড়েছি-আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই একটা কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যেতে পারে।”

সুন্দরবাবু বললেন, শুনলেন তো দারোগাবাবু! এতক্ষণ ধরে এত যমযন্ত্রণা যখন ভোগ করলুম, তখন আর মিনিট পনেরোর জন্যে অশান্তি সৃষ্টি করে লাভ কী? বিশেষ, উদরে হয়েছে এখন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার উদয়-আর খোরাক আছে ওই মানিকেরই ব্যাগের জঠরে! আমরা এখান থেকে এখনই বিদায় নিতে চাইলে মানিক কি আর ব্যাগ খুলতে রাজি হবে?”

জোর মাথা নাড়া দিয়ে মানিক বললে, “নিশ্চয়ই নয়!”

- “ওরে বাবা, ব্যাস! এর ওপরে আর কোনেও কথা বলাই বাতুলতা! হাতের খোরাক পায়ে ঠেলে উপোস করে ধুঁকতে ধুঁকতে আমি যাব কোদালপুরে ফিরে? হুম, হুম, হুম! অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব! অন্তত মানিকের ব্যাগের ভিতরে যে অশ্বডিম্ব নেই, সেটা আমি রীতিমতো হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি!”

দারোগাবাবু নিরুত্তর হয়েই রইলেন। তার অবস্থা দেখলে মনে হয় একেবারে যাকে বলে-নাচার আর কি!

তারপর খানিকক্ষন আর কোনও কথাবার্তা হল না। অরণ্যের অবস্থা তখনও একই রকম-আধা আলো আঁধার-মাখা রহস্যময় আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে অগণ্য বনস্পতি মর্মর-ভাষায় রচনা করছে কোন অজানার পূজার মন্ত্র।

মানিক দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, “পায়ের তলায় মাটি এখানে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে কেন?”

জয়ন্ত এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, “মানিক, মাটি এদিকে ঢালু হয়ে নেমে, ওদিকে আবার উঁচু হয়ে উপর দিকে উঠে গিয়েছে। আগে নিশ্চয়ই এখানে একটা জলভরা খাত ছিল।”

সেই শুকনো খাতের অন্য পাড়ের উপরে রয়েছে একটা জঙ্গলময় উঁচু ঢিপি, যেন একটা ছোটোখাটো পাহাড়। ঢিপিটা দখল করে আছে অনেকখানি জায়গা।

ঢিপির উপরে উঠে দেখা গেল তার চারিদিকেই ছড়িয়ে পড়ে আছে রাশি রাশি সেকেলে ইট। আর একটা দৃশ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ওপাশে ঢিপিটা যেখানে নীচের দিকে নেমে শেষ হয়ে গিয়েছে, ঠিক সেইখানে রয়েছে প্রকাণ্ড একখানা অট্টালিকার ধ্বংসস্তুপ! একেবারে ধ্বংসস্তূপ বললে ঠিক বলা হয় না, কারণ সর্বাঙ্গে ছোটো-বড়ো অসত্থ-বট-নিম গাছের ভার বহন করে অট্টালিকার একটা অংশ এখনও দাঁড়িয়েছিল মহাকালের বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিবাদের মতো।

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "সুন্দরবাবু, আমার কল্পনাদেবী মিথ্যে কথা বলেননি। এই আমাদের পথের শেষ।"

সুন্দরবাবু উৎসাহের লক্ষণ প্রকাশ করলেন না। বললেন, "সমাপ্তিটা আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে না।'

জয়ন্ত বললে, "আরে মশাই, আমরা কোথায় এসেছি বুঝতে পারছেন না? সুব্রতবাবু, সারা পথটাই আপনি বোবার মতন কাটিয়ে দিয়েছেন। এইবারে মুখ খুলুন। বলুন দেখি, কোথায় এসেছি আমরা?"

- "আমি কেমন করে বলব?"

- "তাহলে শুনুন। এই যে চারিদিকে খাত-ঘেরা উঁচু ঢিপিটা দেখছেন, এটা হচ্ছে কোনও পুরাতন দুর্গের শেষচিহ্ন। আর ওই ভাঙাচোরা অট্টালিকা হচ্ছে সেকালকার কোনও রাজার বাড়ি! খুব সম্ভব ওইখানেই বাস করতেন সেই বাঘরাজারা, যাদের সম্বন্ধে সোনার আনারসের ছড়ায় বলা হয়েছে-

'বাঘরাজাদের রাজ্য গেছে,
কেবল আছে একটি স্মৃতি,
ব্রহ্মপিশাচ পানাই বাজায়,
বাস্তুঘুঘু কাঁদছে নিতি।'

বুঝলেন?"

সুব্রত বললে, "আপনি কেমন করে এই সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন, এখনও তা বুঝতে পারছি না।"

- "যথাসময়ে তা বলব। এতক্ষণ পর্যন্ত ছড়া আমাদের ঠিক পথেই নিয়ে এসেছে। এইবারে দেখতে হবে ছড়ার শেষ দুই পঙ্‌ক্তির অর্থ আবিষ্কার করা যায় কি না। সুব্রতবাবু, অতঃপর হতভম্ব ভাবটা ত্যাগ করে আপনি কিঞ্চিৎ জাগ্রত হবার চেষ্টা করুন!"

- "কেন বলুন দেখি?"

- "হয়তো আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হেঁয়ালি ছেড়ে সাদা ভাষায় কথা কও জয়ন্ত! তুমি কী করতে চাও?"

- "ওই ভাঙা অট্টালিকার ভিতরে ঢুকতে চাই।"

- "কারণ?"

- "কারণ ছড়ার রচয়িতার হুকুম।"

দারোগাবাবু একটা শ্রান্ত, বিরক্তিজনক মুখভঙ্গি করলেন নির্বাকভাবে।

॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

অন্দরমহলের কূপঘর

অট্টালিকার এ-অংশটাকে বাইরে থেকে যতটা ভাঙাচোরা বলে মনে হচ্ছিল, ভিতরে এসে দেখা গেল তার দুর্দশা হয়নি ততটা।

মস্ত একটা উঠান-তার সর্বত্র আগাছার রাজত্ব। উঠানের চারিদিকেই চকমিলানো ঘর। কোনও কোনও ঘরের ছাদ বা দেওয়াল ভেঙে পড়েছে এবং কোনও কোনও ঘরের দরজা বা জানলা নেই বটে, কিন্তু কয়েকটা ঘর এখনও অটুট অবস্থাতেই বিদ্যমান আছে।

এ-ঘর সে-ঘরের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে জয়ন্ত বললে, "মনে হচ্ছে এ-অংশে ছিল রাজবাড়ির অন্দর-মহল। মানিক, এখানকার ভিত আর দরজা-জানলার স্থূলতা

দ্যাখো। এ-অংশটাকে বোধহয় সুদৃঢ় আর সুরক্ষিত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছিল।”

মানিক বললে, “হয়তো সেই জন্যেই রাজবাড়ির এদিকটা এখনও ভেঙে পড়েনি।”

- “খুব সম্ভব তাই।”

তখনও ভালো করে সন্ধ্যা নামেনি বটে, কিন্তু বাড়ির উঠানে হয়েছে আবছায়ার সঞ্চার। এবং নীচেকার ঘরগুলোর ভিতরে ঢুকলে চোখ হয়ে যায় প্রায় অন্ধ।

জয়ন্ত বললে, “আমাদের সঙ্গে একটা পেট্রলের লণ্ঠন আছে। মানিক, সেটা জেলে ফ্যালো তো, ওদিকের ঘরগুলো এখনও পরীক্ষা করা হয়নি।”

সুন্দরবাবু নীরস কণ্ঠে বললেন, “সন্ধে না হতেই বাড়িখানাকে হানাবাড়ি বলে সন্দেহ হচ্ছে। এখানে এত পরীক্ষা-টরীক্ষার দরকার কী আছে বাপু? এখানে দেখবার আছেটা কী?”

- “বলেছি তো আমি এখানে এসেছি অশ্বডিম্বের সন্ধানে। যতক্ষণ না তা পাই, খুঁজতে হবে বইকী!” জয়ন্ত বললে গম্ভীর কণ্ঠে।

মানিক আলো জ্বালতে জ্বালতে ততোধিক গম্ভীর স্বরে বললে, “অশ্বডিম্বের ওমলেট অতিশয় সুস্বাদু। সুন্দরবাবু যদি ভক্ষণ করতে রাজি হন, আমি স্বহস্তে প্রস্তুত করতে পারি।”

হ্যা কিংবা না, কিছুই বললেন না সুন্দরবাবু, কেবল মানিকের দিকে নিক্ষেপ করলেন একটি জ্বলন্ত ক্রোধকটাক্ষ। বোধ করি এইরকম কোনও কটাক্ষেরই দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেব একদা ভস্ম করে ফেলেছিলেন মদন ঠাকুরকে। ভাগ্যে সুন্দরবাবু মহাদেব নন, এ-যাত্রায় তাই বেঁচে গেল মানিক।

পেট্রলের প্রদীপ্ত লণ্ঠনটি তুলে নিয়ে জয়ন্ত একটা ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বললে, “মানিক!”

- “কী?”

- “ঘরের মাঝখানে কী রয়েছে দেখছ?”

- “হ্যাঁ, একটা বড়ো কূপ।”

- “কিন্তু ঘরের ভিতরে কূপ!”

- "তোমার মতে এদিকটা হচ্ছে রাজবাড়ির অন্দরমহল?"

- "হ্যাঁ।"

- "হয়তো এই ঘরটা ছিল রাজবাড়ির মেয়েদের স্নানাগার। সেকালে তো কলের জল ছিল না, তাই অন্তঃপুরের জন্যে এই কূপ খনন করা হয়েছিল।"

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মতো বললে, "মানিক, তোমার অনুমান অসঙ্গত নয়। কিন্তু- কিন্তু-" বলতে বলতে থেমে গিয়ে নিশ্চল হিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষন।

তারপর সে অগ্রসর হয়ে একটা তীব্র শক্তিসম্পন্ন মস্ত টর্চের আলোক-শিখা নিক্ষেপ করলে কূপের মধ্যে।

রীতিমতো গভীর কূপ। জল চকচক করে উঠল তার অনেক নীচে।

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবলে। তারপর হঠাৎ ফিরে বললে, "মানিক, বার করো একগাছা লম্বা আর মোটা দড়ি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! দড়ি নিয়ে কী হবে শুনি?"

- "দড়ি অবলম্বন করে আমি এই কূপের ভিতরে গিয়ে নামব।"

সুন্দরবাবু শিউরে উঠে বললেন, "বাপ রে, কেন?"

- "হয়তো ওইখানেই পাব অশ্বডিম্বের সন্ধান!"

সুন্দরবাবু দুই চক্ষু রসগোল্লার মতন করে তুলে বললেন, "জয়ন্ত! ভাই জয়ন্ত! মিনতি করি, ক্ষান্ত হও! ছড়ার কথা তুমি সত্যি বলে মানো, অথচ ভুলে যাচ্ছ কেন যে, ছড়ায় লেখা আছে এখানে ব্রহ্মপিশাচ পানাই বাজায়?"

মানিক বললে, "পানাই মানে কি জানেন?"

সুন্দরবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, "না। আর জেনেও দরকার নেই আমার। কারণ ব্রহ্মপিশাচ যখন 'পানাই' বাজায়, তখন নিশ্চয়ই সেটা হচ্ছে কোনওরকম ভয়ঙ্কর সৃষ্টিছাড়া বাদ্যযন্ত্র-মানুষের পক্ষে যা স্পর্শ করাও অসম্ভব!"

- "মোটেই নয়। 'পানাই' বলতে বোঝায় 'খড়ম'! ব্রহ্মদৈত্যরা পায়ে খড়ম পরে, জানেন তো? এ হচ্ছে সেই খড়ম।"

- "হুম! ব্রহ্মদৈত্যের পায়ের খড়ম! আমরা যেমন হাততালি দি, তারা বুঝি তেমনি পা-তালি না দিয়ে পায়ের খড়ম খুলে খটাখট আওয়াজ সৃষ্টি করে? হতে পারে-

ব্রহ্মদৈত্যদের পক্ষে অসম্ভব কী বাবা? জয়ন্ত, দোহাই তোমার! ও পাতকুয়োর ভেতর ঢোকবার চেষ্টা তুমি কোরো না, হুম!"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "সুন্দরবাবু, ও-কথা যাক। কিন্তু এইবারে আপনিও আমাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করুন দেখি!"

সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "এ রকম ব্যাপারে আমি তোমাকে কী সাহায্য করতে পারি?"

- "দড়ি বয়ে আমি যখন কূপের ভিতর নামব, তখন আর একগাছা দড়িতে পেট্রলের লণ্ঠনটা বেঁধে ঠিক আমার সঙ্গে সঙ্গেই নীচে নামিয়ে দিতে হবে। কেমন, এ কাজটা পারবেন তো?"

- "তা কেন পারব না!"



জয়ন্ত দড়ি ধরে কূপের গহ্বরে প্রবেশ করলে। পেট্রলের ঝুলন্ত লণ্ঠনটাও চারিদিক আলোকে সমুজ্জ্বল করে নীচের দিকে নামতে লাগল তার সঙ্গে সঙ্গে। সেই বহুযুগের পুরাতন ও অব্যবহৃত কূপের জঠরে আচম্বিতে এই অভাবিত আলোক সমারোহে বিস্মিত হয়ে নানা ছিদ্র ও ফাটলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল দলে দলে হিলহিলে বৃশ্চিক ও ঊর্ধ্বপুচ্ছ কাঁকড়াবিছে প্রভৃতি জীব। এক জায়গায় মুহূর্তের জন্যে মুখ বাড়িয়ে দুটো অগ্নিময় ক্রুদ্ধ চক্ষে তীব্র ঘৃণা বৃষ্টি করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল একটা অন্ধকারেরও চেয়ে কালো সাপ। কোনও গর্তের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠল একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর চিৎকার!

সুন্দরবাবু চমকে বলে উঠলেন, "ওরে বাবা, পাতালের ভিতরে ওটা আবার চ্যাঁচায় কে?"

সুব্রত বললে, "তক্ষক।"

কূপের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে জয়ন্ত বললে, "সুন্দরবাবু, এইবারে লণ্ঠনটা আস্তে আস্তে উপরে তুলে নিন।"

জয়ন্ত আবার উপরে এসে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে পরিতৃপ্ত আনন্দের আভাস।

মানিক সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "কী দেখলে জয়ন্ত?"

- "আমার সন্দেহ মিথ্যা নয়।"

- "অর্থাৎ?"

- "অনেক নীচে, কূপের জল থেকে খানিক উপরে দেওয়ালের গায়ে আছে একটা লোহার দরজা।"

- "লোহার দরজা?"

- "হ্যাঁ। বন্ধ দরজা। তার বাইরে রয়েছে মস্ত দুটো কুলুপ।"

সুব্রত অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বললে, "এর অর্থ কী জয়ন্তবাবু?"

- "আমার বিশ্বাস, ওই দরজার ও-পাশেই আছে সোনার আনারসের সমস্ত রহস্য!"

- "সোনার আনারসের রহস্য?"

- "হ্যাঁ সুব্রতবাবু। বাঘরাজাদের গুপ্তধন!"

পর-মুহূর্তেই চারিদিকের স্তব্ধতা চুরমার করে দিয়ে বজ্রস্বরে গর্জে উঠল দু'দুটো বন্দুক! দুটো বুলেট এসে লাগল দেওয়ালের উপরে সশব্দে।

জয়ন্ত বলে উঠল, "শত্রুরা আসছে আক্রমণ করতে। ওই দরজা দিয়ে পাশের ঘরে চলো...শিগগির!"

কূপঘরের ভিতর দিয়েই পাশের ঘরে যাবার দরজা। তার একখানা পাল্লা ভাঙা। সে-ঘর থেকেও অন্য ঘরে যাবার আর একটা দরজা। তার পাল্লা আছে বটে, কিন্তু অর্গল নেই। তারও ওদিকে আছে দরজা দিয়ে ও-পাশের ঘরে যাবার পথ-সকলে দ্রুতবেগে সেই তৃতীয় ঘরের ভিতরে এসে পড়ল।

জয়ন্ত ভিতর থেকে দরজার অর্গল তুলে দিলে।

খানিকক্ষণ কারুর মুখেই কথা নেই। শত্রুরা যে পিছনে আসছে, এমন সাড়াও পাওয়ার গেল না।

হঠাৎ এ-ঘরের দরজার উপরে খট করে একটা শব্দ হল। জয়ন্ত তিক্তহাসি হেসে বললে, "মানিক, আমরা বন্দি হলুম। এ-ঘরের দরজার বাইরে থেকে কে শিকল তুলে দিলে। সোনার আনারসের স্বপ্ন বুঝি ফুরিয়ে যায়!"

।। ত্রয়োদশ অধ্যায় ।।

ঈশ্বর-প্রেরিত দূত

দারোগাবাবু বললেন, "বেশ জয়ন্তবাবু! অকারণে এখানে টেনে এনে আপনি খুব বিপদে ফেললেন যা হোক!"

জয়ন্ত বললে, "আমি নই, আমাদের এই বিপদের জন্যে দায়ী আপনার আসামি প্রতাপ চৌধুরিই।"

- "কী বলছেন?"

- "প্রতাপ চৌধুরির কথা বলছি। আমরা এখন তারই হাতে বন্দি। সুব্রতবাবু, আপনাদের পূর্বপুরুষেরা অন্তিমকালে উত্তরাধিকারিদের কী বলে যেতেন?"

- "বলে যেতেন, 'যদি কোনও দিন বিশেষ অর্থাভাব হয় তাহলে সোনার আনারসের মধ্যেই পাবে অর্থের সন্ধান'।"

- "সোনার আনারসের মধ্যে একটা ছড়ায় কৌশলে লেখা ছিল ওই অর্থের ঠিকানা, আজ আমরা যা আবিষ্কার করেছি। প্রতাপ চৌধুরিও এত দিন ধরে সেই ঠিকানাটাই আবিষ্কার করবার চেষ্টায় ছিল। এখানকার যত হাঙ্গামার আসল কারণই হচ্ছে তাই। আজ সে তার দল-বল নিয়ে গোপনে আমাদের অনুসরণ করেছিল, উত্তেজনার মুখে পড়ে যে-সম্ভাবনার কথা ভুলে গিয়ে আমি বোকামি করেছি!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম, প্রতাপ চৌধুরি বেটা এখন কী করতে চায়?"

"নিশ্চয়ই সে আড়াল থেকে আমাদের সব কথা শুনেছে-আমাদের সব কার্যকলাপ লক্ষ করেছে। তাই গুপ্তধনের ঠিকানা জানার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের আক্রমণ করেছিল। এখন আমরা অসহায়ভাবে বন্দি। সে স্বাধীন। এইবারে সে গুপ্ত ধনভাণ্ডারের লোহার দরজা খোলবার চেষ্টা করবে। হায় রে কপাল, আমাদের নৌকো কিনা ঘাটে এসেও ডুবে গেল!"

মানিক বললে, "জয়, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে কি ও-দরজাটা ভেঙে ফেলতে পারব না?"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "না। একেলে দরজা হলে আমার কোনওই ভাবনা ছিল না-আমি একলাই পারতুম ভেঙে ফেলতে। কিন্তু এই সেকেলে দরজাটা বিশেষ কারণে বিশেষভাবে তৈরি। মত্ত মাতঙ্গও ভাঙতে পারবে না এ দরজা! নীচেকার এই ঘরটাও অদ্ভুত, একটা জানলা পর্যন্ত নেই-দেওয়ালের অনেক উপরে আছে কেবল গোটাকয়েক ফোকর, কিন্তু তাদের ভিতর দিয়ে মানুষের মাথাও গলবে না। কে জানে, কী উদ্দেশে এরকম ঘর তৈরি করা হয়েছিল! আগে কি এখানে থাকত কয়েদিরা? হতে পারে, আশ্চর্য কী!"

সকলে গুম হয়ে বসে রইল বেশ খানিকক্ষণ। কারুরই যেন নেই কথা কইবার ইচ্ছা।

আচম্বিতে বাইরেকার নিস্তব্ধ রাত্রিকে বিদীর্ণ করে জাগ্রত হল বহু কণ্ঠস্বরে আনন্দ-কোলাহল!

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, "ও আবার কী?"

জয়ন্ত শ্রান্ত, বিষন্ন স্বরে বললে, “ওই আনন্দ কোলাহল শুনেই বুঝতে পারছি, আজ প্রতাপ চৌধুরির হস্তগত হয়েছে বাঘরাজাদের গুপ্তধন!”

সুব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে।

তার একখানা হাত নিজের হাতে নিয়ে মানিক দরদভরা কণ্ঠে বললে, “সুব্রতবাবু, আপনার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি।”

জয়ন্ত হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠে বললে, “ধ্যেৎ! দুঃখের নিকুচি করেছে! মানিক, চটপট বার করো ‘ফ্লাস্কে’র চা আর ডিম। দু-একখানা হাতে-তৈরি রুটি আর দু-একটা কদলীও বোধহয় এখনও আমরা প্রত্যেকেই পেতে পারি! প্রতাপ চৌধুরি যখন কদলী-প্রদর্শন করলে, তখন দু-একটা কদলী আমরাই বা ভক্ষণ করব না কেন? আসুন দারোগাবাবু, আসুন সুব্রতবাবু, আসুন সুন্দরবাবু! এত গোলযোগের পর কিঞ্চিৎ জলযোগ নিশ্চয়ই আপনাদের মন্দ লাগবেনা?”

সুন্দরবাবু তৎক্ষণাৎ হলেন উৎফুল্ল। বললেন কেবল- “হুম!”

- “মানিকের ব্যাগে কালকের জন্যে হয়তো আরও কিঞ্চিৎ খাদ্যের অস্তিত্ব থাকবে। তারপরে আমাদের ভাগ্যে আছে উপবাস-যত দিন না মরি ততদিন পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস! মন্দ কী? এই উপবাসকে আমরা যদি বলি প্রায়োপবেশন, তাহলে তো আমাদের মৃত্যু হবে গৌরবজনক! গ্রিক-বিজয়ী মহাবীর, অখণ্ড ভারতের প্রথম সম্রাট চন্দ্রগুপ্তও তো যেচেই প্রায়োপবেশনে করেছিলেন প্রাণত্যাগ! আমরাই বা পারব না কেন?”

সুন্দরবাবু অভিযোগভরা কণ্ঠে বললেন, “ওই তো তোমাদের দোষ! খাবার আগেই উপবাস আর মৃত্যুর কথা তুলে মেজাজ খারাপ করে দাও কেন ভায়া! হুম, আমার গলা দিয়ে আর রুটিও গলবে না!”

ঠিক সেই সময়ে বন্ধ দরজা ভেদ করে হঠাৎ জেগে উঠল একটা অস্বাভাবিক অট্টহাস্য!

হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা, - সে অট্টহাসি যেন আর থামতেই চায়না!

সকলের দেহ হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত! এমন অট্টহাসি কল্পনাতীত!

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "ব্রহ্মপিশাচ, ব্রহ্মপিশাচ-এইবারে আসছে ব্রহ্মপিশাচ!"

দারোগাবাবু অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ে গেলেন ঘরের মেঝের উপরে! সুব্রতর মুখ দেখে মনে হয় সেও যেন অজ্ঞান হবার চেষ্টা করছে!

মানিক রিভলভার বার করে দাঁড়িয়ে বিভ্রান্তের মতন বললে, "ভূতই আসুক, আর মানুষই আসুক, আমি গুলির পর গুলি ছুড়ে তাকে ছিদ্রময় না করে ছাড়ব না!"

জয়ন্ত নিশ্চল এবং নিস্তব্ধ। এমন যুক্তিহীন অট্টহাস্যের অর্থই খুঁজে পেলে না।

তারপরেই হঠাৎ অট্টহাসি থামিয়ে কে বলে উঠল, "হায় রে হায়, হায় রে পোড়াকপাল আমার! বাঘরাজাদের রাজ্য গেছে কিন্তু ছিল তাদের গুপ্তধন! তাও নিয়ে গেল দুশমনরা! আমার সুখের স্বপন ভেঙে গেল-এ দুঃখ রাখব কোথায় গো, রাখব কোথায়? হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা!"

জয়ন্তের ছুটে গেল সমস্ত জড়তা! বন্ধ-দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে করাঘাতের পর করাঘাত করতে করতে সে বললে, "ভূষোপাগলা, ভূষোপাগলা, ভূষোপাগলা!"

দরজার ও-পাশ থেকে শোনা গেল, "আমাকে চিনেছ? চিনবেই তো, চিনবেই তো! তোমরা যে আমার বন্ধু! আমি যে এখানে এসেছি তোমাদের মুক্তি দিতেই!"

- "দাও, দাও, আমাদের মুক্তি দাও-তুমি হচ্ছো ঈশ্বর-প্রেরিত দূত!"

শিকল খোলার শব্দ। তারপরেই দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে ভূষোপাগলা।

জয়ন্ত সাদরে ভূষোকে আলিঙ্গন করে বললে, "তুমি কী করে এখানে এলে?"

- "কী করে এলুম? কী করে এলুম? সে অনেক কথা! এখন খালি একটুখানি শুনে রাখো। তোমরাও যে এদিকে এসেছ আমি তা জানতুম না। বেড়াতে বেড়াতে দেখলুম, প্রতাপ চৌধুরি দলে বেশ ভারী হয়ে বনের দিকে যাচ্ছে। মনে কৌতুহল জাগল। লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের পিছু নিলুম। সোজা হাজির হলুম এইখানে। সন্ধ্যার অন্ধকারে উঠোনের লম্বা আগাছার ভিতরে হুমড়ি খেয়ে বসে এখানকার সব অভিনয় দেখলুম। তোমরা বন্দি হবার পরও কত কাণ্ডই যে হল! শেষটা দেখলুম, প্রতাপ চৌধুরির দল আটটা বড়ো ঘড়া আর একটা মাঝারি আকারের সিন্দুক কাঁধে করে এখান থেকে সরে পড়ল! হায় রে হায়, কেমন করে এমন ব্যাপার সম্ভব হল, এখনও

আমার মাথায় ঢুকছে না গো! আয়নাতে মুখ দেখে বৃদ্ধ বট এখনও গান গাইছে, কিন্তু একটাও জলগ টিকটিকি দেখা দিলে না বলেই তো আমার সব
হিসাব একেবারে গুলিয়ে গেল! সোনার স্বপন ভেঙে গেছে, আমি কী নিয়ে বেঁচে থাকব?"

জয়ন্ত তাকে প্রবোধ দিয়ে বললে, "কোনও ভয় নেই ভাই, মুক্তি যখন পেয়েছি, তোমার স্বপ্নকে সফল না করে আমরা ছাড়ব না! কিন্তু কী বললে? প্রতাপ চৌধুরির দল কী কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছে?"

- "আটটা ঘড়া আর একটা সিন্দুক!"

- "গুপ্তধন!"

- "হায় হায় হায় হায়-হুম!"

- "এখানে বসে হায় হায় করে কোনওই লাভ নেই সুন্দরবাবু, জাগ্রত হোন-উঠে দাঁড়ান-ছুটে চলুন!"

- "ও বাবা, কোথায়?"

- "প্রতাপ চৌধুরিদের পিছনে।"

- "বলো কী হে? এমন রাতে, এমন অন্ধকারে, ওই সর্বনেশে বনে?"

- "নিশ্চয়! চলুন, এখন প্রত্যেক মুহূর্তই মূল্যবান!"

- "তারা তো অনেকক্ষণ আগে রওনা হয়ে গিয়েছে, আমরা তাদের পিছু ধরতে পারব কেন?"

- "বাজে কথায় সময় নষ্ট করবেন না। প্রতাপ চৌধ জানে আমরা বন্দি, তারা নিষ্কণ্টক। এত পরিশ্রমের পর আজ রাত্রে নিশ্চয়ই তারা কোদালপুর ত্যাগ করবার চেষ্টা করবে না। এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।"

- "কিন্তু চা-রুটি-ডিমগুলো খেয়ে একটু চাঙ্গা হতেও কি পারব না?"

দারোগাবাবু বললেন, "জয়ন্তবাবুর কথা শুনেই আমি চাঙ্গা হয়ে উঠেছি-চুলোয় যাক চা-রুটি-ডিম! আসামিকে ধরতে হবে আজই।"

।। চতুর্দশ অধ্যায় ।।

সোনার আনারসের ছড়া

অন্ধকার অরণ্য! আকাশে চাঁদ আছে বটে, কিন্তু দিনের সূর্য যেখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, সেখানে রাতের চাঁদের কথা না তোলাই ভালো। ভয়াবহ বন হয়ে উঠেছে অধিকতর বিভীষণ।

জয়ন্ত বললে, "ভাগ্যে সকালে বেরুবার আগে মানিকের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলুম! সঙ্গে পেট্রলের লণ্ঠন আর টর্চ না থাকলে এখানে আমাদের কী দুর্দশাই হত!"

সুন্দরবাবু বললে, "সঙ্গে আলো না থাকলে আমি এখানে আসতুম নাকি?"

জয়ন্ত বললে, "আচ্ছা, পথ চলতে চলতে আমি এইবারে কতগুলো কথা বলব, আপনারা মন দিয়ে শুনুন। কথাগুলো আর কিছু নয়, সোনার আনারসের গুপ্তকথা। সোনার আনারসের ছড়ার কথা মনে করুন। সহজভাবে দেখলে ছড়াটাকে অর্থহীন বলে মনে হয়। কিন্তু একটা অর্থহীন ছড়াকে বংশানুক্রমে এত যত্নে রক্ষা করা যায় না, আর কেবল সেই ছড়াকেই চুরি করবার জন্যে বাড়িতে চোর আসে না। বিশেষ, সুব্রতবাবুর পূর্বপুরুষরা স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন-অর্থাভাবের সময়ে ওই ছড়ার মধ্যেই পাওয়া যাবে অর্থের সন্ধান! এইসব কারণে প্রথমেই করলুম ছড়াটার মানে বোঝবার চেষ্টা।

'আয়নাতে ওই মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা
খুঁজছে মাটি মোটকা জট!'

আমি যা মানে করলুম তা হচ্ছে এই : আয়না-অর্থাৎ পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়িয়ে এক প্রাচীন বটবৃক্ষ জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে পত্র-মর্মরধ্বনি করছে। তার মাথায় আছে বকের বাসা। আর তার ডাল থেকে মোটাসোটা জটগুলো নেমে এসেছে মাটি

পর্যন্ত। সুব্রতবাবুর বাগানে ঠিক এই রকম একটি বটগাছের সন্ধান পেয়ে আমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন হল। ছড়াটার মানে কেবল আমিই বুঝিনি। ভূষোপাগলা আর প্রতাপ চৌধুরিও বুঝেছিল। কিন্তু বিশেষ এক জায়গায় তারা অর্থের খেই হারিয়ে ফেলে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথমে আমিও সেই পর্যন্ত এগিয়ে সমস্ত গুলিয়ে ফেলেছিলুম, তারপর মাথা খাটিয়ে হঠাৎ পাই আলোকের সন্ধান। সে-জায়গাটা হচ্ছে এই :

'পশ্চিমাতে পঞ্চ পোয়া,
সূয্যিমামার ঝিকমিকি,
নায়ের পরে যায়ে কত না,
খেলছে জলগ টিকটিকি।'

মানে হচ্ছে, বটগাছের পশ্চিমদিকে সোজা পাঁচ পোয়া পথ অগ্রসর হতে হবে। সেখানে চারিদিকে ঝিকমিক করছে সূর্যালোক। নদীর উপরে ভেসে যাচ্ছে নৌকোর ('না' বলে নৌকোকেই) পর নৌকো, আর জলে খেলা করছে কারা? না 'জলগ টিকটিকি'রা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এখানে জলবাসী টিকটিকি হচ্ছে কুমির-কারণ তাকে দেখতে অনেকটা গৃহবাসী টিকটিকির বৃহৎ সংস্করণেরই মতো!

অর্থ হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোল বাধল। কারণ, বটগাছ পিছনে রেখে পশ্চিমদিকে সোজা পাঁচ পোয়া পথ এগিয়ে কোনও নদী দেখা যায় না। এই জন্যেই এই পর্যন্ত এসে ভূষোপাগলা রোজ হতভম্ব হয়ে ঘুরে মরত; আমাকেও প্রথমটা বোকা বনে যেতে হয়েছিল। কিন্তু আমি এত সহজে হার মানতে রাজি নই। মাথা খাটিয়ে সুব্রতবাবুকে প্রশ্ন করে জানতে পারলুম, সত্যই এ অঞ্চলে আগে একটি নদী ছিল কিন্তু এখন তা শুকিয়ে গিয়েছে, কেবল কোদালপুরের উত্তর-পশ্চিমদিকে তিন মাইলের কিছু বেশি দূরে গেলে আজও তার মরা খাত দেখা যায়। তারপর যথাস্থানে গিয়ে কী করে আন্দাজ করলুম যে, নদীটার গতি ছিল সেখান থেকে দক্ষিণ মুখে, আপনারা সকলেই তা জানেন। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সেইখানে ফিরে এলুম, বটগাছ থেকে পশ্চিম মুখে সোজা পাঁচ পোয়া পথ পেরুলে যেখানে এসে উপস্থিত হওয়া যায়।

'অগ্নিকোণে নেইকো আগুন,
-কাঙাল যদি মানিক মাগে,
গহন বনে কাটিয়ে দেবে
রাত্রি-দিবার অষ্ট ভাগে।'

অর্থ-(পশ্চিমে পাঁচ পোয়া পথ পার হয়ে নদীর ধারে গিয়ে দেখবে) অগ্নিকোণে- অর্থাৎ পূর্ব-দক্ষিণদিকে এক অরণ্য। কাঙাল যদি ঐশ্বর্য চায় তাহলে ওই গভীর বনের ভিতর দিয়ে অগ্নিকোণের দিকে লক্ষ রেখে এক প্রহর বা তিন ঘণ্টা (দিন-রাতকে আট অংশে ভাগ করলে এক প্রহর হয়) ধরে অগ্রসর হবে।

'বাঘরাজাদের রাজ্য গেছে,
কেবল আছে একটি স্মৃতি,
ব্রহ্মপিশাচ পানাই বাজায়,
বাস্তুঘুঘু কাঁদছে নিতি।'

ছড়ার এইখানটায় কিঞ্চিৎ কবিত্ব প্রকাশ করে ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে, এক প্রহর ধরে এগুবার পর পাওয়া যাবে বাঘরাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

'সেইখানেতে জলচারী
আলো-আঁধির যাওয়া-আসা,
সর্পনৃপের দর্প ভেঙে
বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা।'

অর্থ- বাঘরাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এমন একটি ঠাঁই আছে, যেখানে জলের উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করে আলো আর আঁধার। 'সর্পনৃপ' কে? বাসুকি- রাজ্য যাঁর পাতালে। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' কে? ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী। অর্থাৎ বাসুকির রাজ্য জলময় পাতালে লক্ষ্মী বাস করছেন ঐশ্বর্য নিয়ে।

এতক্ষণে আপনারা বুঝেছেন বোধহয়, ঘরের ভিতর কূপ দেখে আমার সন্দেহ জাগ্রত হয়েছিল কেন? প্রথমত, ঘরের ভিতরে কূপ, বেশ একটু অসাধারণ নয় কি?

দ্বিতীয়ত, কূপের তলদেশটাই সর্পরাজ বাসুকির জলময় পাতালের এক অংশ বলে ধরে নেওয়া যায়। তৃতীয়ত, মাঝে মাঝে এও শুনেছি যে, কোনও কোনও সেকেলে কূপ আর পুষ্করিণীর ভিতর থেকে পাওয়া গিয়েছে গুপ্তধন।

গুপ্তধনের গুপ্তকথা শুনলেন, এইবার অন্য দু-চারটে কথা শুনুন। আমার কী বিশ্বাস জানেন? প্রতাপ চৌধুরির বাড়িতে এখনও পুলিশ পাহারা আছে, সুতরাং সে বাড়ির ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করবে না। অন্তত আজকের রাত্রের জন্যে তাকে আশ্রয় নিতে হবে সেই সুড়ঙ্গপথের মধ্যেই। তারপর কাল সে হয়তো লোকজন আর গুপ্তধন নিয়ে কোদালপুর থেকে হবে অদৃশ্য।

অতএব ভোরের আলো ফোটবার আগেই আমাদের অবতীর্ণ হতে হবে সুড়ঙ্গপথের মধ্যে। শত্রুরা দলে হালকা নয়। কাজেই আমাদেরও দলে ভারী হতে হবে। সঙ্গে যখন দারোগাবাবু আছেন তখন সেজন্যে ভাবনা নেই! সুড়ঙ্গে হানা দেবার আগে থানা থেকে একদল চৌকিদার সংগ্রহ করলেই চলবে। কিন্তু খুব সম্ভব আমরা সহজেই আসামিদের গ্রেপ্তার করতে পারব। প্রতাপের এখন শত্রুভয় নেই। সে আর তার দলের লোকরা পথশ্রমে নিশ্চয়ই শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। হয়তো আমরা গিয়ে দেখব তারা সকলেই করছে নিদ্রাদেবীর আরাধনা।

এই প্রতাপ চৌধুরিকে চোখে দেখবার জন্যে আমার আগ্রহ হচ্ছে। সেই-ই আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। নাটকের সর্বত্রই সে অভিনয় করছে, বারবার আমাদের নাস্তানাবুদ করে মারছে, অথচ একবারও চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করলে না। অপরাধীদের জগতে তাকে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি বলে স্বীকার করতে হয়। তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে।”

॥ পঞ্চদশ অধ্যায় ॥

অন্ধকারের পর আলো

গল্প এক রকম ফুরিয়েই গিয়েছে। আর বেশি কিছু বলবার নেই।

জয়ন্তের অনুমানই সত্য হল। শেষ-দৃশ্যে বইল না রক্তগঙ্গার ঢেউ! নেই চমকানি, নেইকো রোমাঞ্চ।

সুড়ঙ্গে চুপি-চুপি নেমে জয়ন্তরা দেখলে, প্রতাপ চৌধুরি সদলবলে নিদ্রিত। প্রত্যেকেই দেখছিল বোধ করি সফল আশার সুখস্বপ্ন।

কারুর ঘুম ভাঙবার আগেই চৌকিদাররা তাদের উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের মতো। ঘুমের জড়তা ছোটবার আগেই প্রত্যেকের হাতে পড়ল দড়ি বা হাতকড়ি। যেটুকু ধস্তাধস্তি হল তা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

রিভলভারটা আবার খাপে পুরে রেখে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "সুব্রতবাবু, কোন মহাত্মার নাম প্রতাপ চৌধুরি?"

সুব্রত অঙ্গুলিনির্দেশে দেখিয়ে দিলে।



সুড়ঙ্গের মধ্যে যে তিনদিক-ঘেরা ও একদিক-খোলা কুঠুরির মত জায়গা ছিল, সেইখানে একটা খুব সেকেলে পেটিকার উপরে একটি লোক ঘাড় হেঁট করে বসে ছিল। হৃষ্টপুষ্ট ভদ্র চেহারা, ধবধবে ফরসা রং, অতি শৌখিন জামা-কাপড়। দেহে কোথাও এতটুকু শয়তানির ছাপ নেই। সে যে-কোনও সম্ভ্রান্ত সমাজে গিয়ে অনায়াসে মেলামেশা করতে পারে। অন্যান্য দুশমন চেহারার পাশে তাকে দেখাচ্ছিল কেমন খাপছাড়া। যেন বাংলা সাপ্তাহিকের পদ্যগুলোর মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা!

জয়ন্ত একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রতাপ মুখ তুললে-মিষ্ট হাসিমাখা মুখ। বললে, "কী দেখছ?"

- "তুমি প্রতাপ চৌধুরি?"

- "আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।"

- সিংহের মত বিক্রম প্রকাশ করে তুমি কলে পড়লে ইঁদুরের মতো?"

- "কপাল!"

- "কপাল নয়, নিজের বোকামি।"

- "কী রকম?"

- "এই সুড়ঙ্গে না এলে তুমি ধরা পড়তে না।"

- "কেমন করে জানব তোমরা সুড়ঙ্গের খবর রাখো?"

- "গল্পের একচক্ষু হরিণও এই রকম বোকামি করেছিল।"

- "তার উপরে তোমরা ছিলে দূর-বনে বন্দি।"

- "এক ঈশ্বর-প্রেরিত দূত এসে আমাদের মুক্তি দিয়েছে।"

- "কে?"

- "ভূষোপাগলা।"

প্রতাপ মুখ ফিরিয়ে ভূষোর দিকে তাকালে। তার হাসিমুখ হল গম্ভীর। তার দুই চক্ষে ঠিকরে নিবে গেল দুটো বিদ্যুৎকণিকা।

ভূষো পিছিয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

জয়ন্ত বললে, "ভয় কী ভূষো, ভয় কী? পিঞ্জরের সিংহ হয় পরম বৈষ্ণব।"

প্রতাপ হাসতে লাগল। বললে, "ঠিক। যখন পিঞ্জরের বাইরে ছিলুম তখন আমার উচিত ছিল, ও আপদটাকে পথ থেকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া। তা দিইনি বলে এখন আমার অনুতাপ হচ্ছে।"

- "যা গত, তা নিয়ে বুদ্ধিমান শোচনা করে না।"

- "তাও ঠিক। ধন্যবাদ। তুমি দেখছি দার্শনিক।"

- "আপাতত তোমার সঙ্গে আর বেশি আলাপ করবার সময় নেই, এইবার তোমাকে যথাস্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

- "আমি প্রস্তুত কিন্তু তার আগে দুটো কথা বলে যাই। ওই যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আটটা ঘড়া দেখছ, ওর প্রত্যেকটার মধ্যেই আছে দুই হাজার করে বাদশাহী মোহর। ঘড়াগুলোও পরীক্ষা করেছি। প্রত্যেকটাই সোনার ঘড়া। আর এই যে পেটিকার উপরে আমি বসে আছি, এর ভিতরে আছে রাশি রাশি জড়োয়া গয়না আর নানারকম রত্ন- তাদের দাম ঠিক করবার সময় এখনও পাইনি। তোমরা জানো তো, এই গুপ্তধনের উপরে এখন তোমাদের কোনওই দাবি নেই। কারণ, অলিখিত আইনবলে, বেওয়ারিশ গুপ্তধনের অধিকারী হয় আবিষ্কার-কর্তাই। এই গুপ্তধন আবিষ্কার করেছি আমিই। অতএব আমিই এর অধিকারী। কেমন, এ কথা
মানো তো?"

- "তারপর?"

- "আপাতত এই গুপ্তধন তোমার জিম্মায় রেখে গেলুম। যথাসময়ে তোমাকে এর সঠিক হিসাব দাখিল করতে হবে। বুঝলে জয়ন্ত?"

- "হিসাব নেবে কে?"

- "আমি।"

- "তুমি না তোমার প্রেতাত্মা?"

- "মানে?"

- "তুমি নরহত্যা করেছ। তোমার তো শেষ অবলম্বন ফাঁসিকাঠ সম্বল।"

- "আমিই যে নরহত্যা করেছি, আদালতে সেটা প্রমাণ করতে পারবে তো?"

- "ফাঁসিকাঠকে ফাঁকি দিলেও তোমাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বা কারাগারে বাস করতে হবে।"

- "মূর্খ! কোনও কারাগার বা ফাঁসিকাঠ আমার জন্যে তৈরি হয়নি আজও।"

- "বেশ, দেখা যাবে।"

- "হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো। দেখা যাবে।"

জয়ন্ত ফিরে বললে, "দারোগাবাবু, কয়েদিদের যথাস্থানে প্রেরণ করুন।"

প্রতাপ চৌধুরি সদলবলে যাত্রা করলে চৌকিদার প্রভৃতির সঙ্গে থানার পথে।

সুন্দরবাবু সাগ্রহে বললেন, "এইবারে দেখা যাক ঘড়াগুলো আর ওই পেটিকার মধ্যে কী আছে!"

জয়ন্ত বললে, "গুপ্তধন সুব্রতবাবুর হাতে তুলে দিয়েই আমার কর্তব্য শেষ করলুম। আমার আর মানিকের আর কিছুই দেখবার দরকার নেই।"

- "হুম, সে কী হে?"

জয়ন্ত সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ফিরে বললে, "সুব্রতবাবু, এই রইল আপনার গুপ্তধন। কিন্তু বিদায় নেবার আগে আপনার কাছে আমার অনুরোধ আছে।"

- "আজ্ঞে, অনুরোধ নয়, হুকুম!"

- "বেশ, তাই। শুনুন। ভূষোপাগলা গুপ্তধনের বিফল স্বপ্ন দেখে নিজের জীবনকে প্রায় ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আজ সে না থাকলে আপনি প্রাণেও বাঁচতেন না, আর গুপ্তধন থেকেও হতেন বঞ্চিত। অতএব এই বিপুল ঐশ্বর্যের ষোলো ভাগের মাত্র এক ভাগ তাকে দান করতে কি আপনার আপত্তি আছে?"

- "নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয়। আজ থেকে ভূষো হবে আমার পরম আত্মীয়ের মতো।"

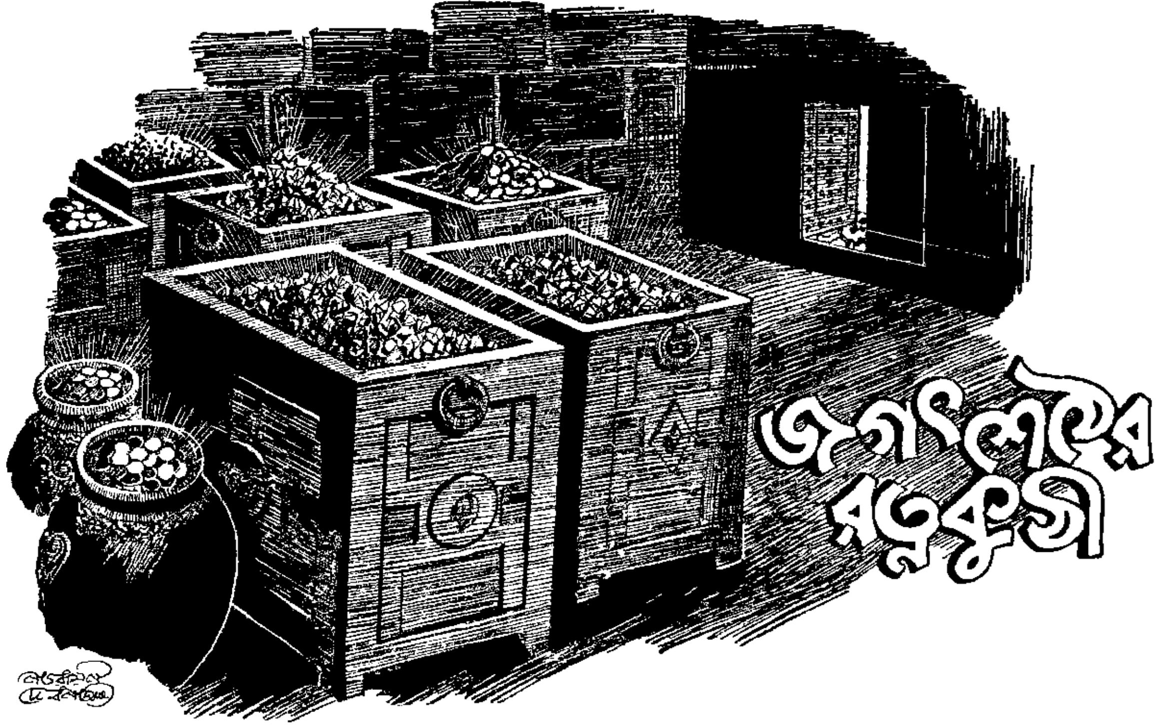
- "উত্তম। তারপর, ষোলো ভাগের আর এক ভাগ থেকে আপনি যদি সুন্দরবাবু আর দারোগাবাবুকে আধা-আধি বখরা দেন, তাহলে আমি অত্যন্ত বাধিত হব।"

- "অবশ্যই দেব। আপনাদেরও তো এই গুপ্তধনের উপর দাবি আছে।"

জয়ন্ত হো-হো করে হেসে উঠল। বললে, "গুপ্ত বা ব্যক্ত কোনও ধনের লোভেই আমরা কোনও কাজ করি না। গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে শখ। ভগবান আমাকে আর মানিককে যা দিয়েছেন, তা আমাদের পক্ষে যথেষ্টরও বেশি। তাতেই আমরা খুশি।

এসো হে মানিক! সুড়ঙ্গের ভিতর আর কীটের মতন বাস করি কেন, বাইরে এতক্ষণে পাখিরা গাইছে প্রভাতী গান-নতুন সূর্য সোনায় মুড়ে দিচ্ছেন পৃথিবীকে। চলো, অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আমরাও যোগ দিই শুভ্র আলোকের পবিত্র অভিনন্দনে।”





॥ প্রথম অধ্যায় ॥

ঘটনার রহস্য

দোতলার বৈঠকখানা। আসনে আসীন দুই বন্ধু-ভাব যাদের গলায় গলায়। জয়ন্ত ও মানিকের কথা বলছি। চলছিল আলোচনা । সরকারি পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের বিখ্যাত কর্মচারী সুন্দরবাবু সম্প্রতি 'পেনশন' নিয়েছেন, তাই নিয়েই আলোচনা।

মানিক মত প্রকাশ করলে, "জয়ন্ত, এইবার আমাদের গোয়েন্দাগিরির শখ বোধহয় শিকেয় উঠল।"

জয়ন্ত বললে, "কেন?"

- "আমাদের বেশির ভাগ মামলা আসত সুন্দরবাবুর মারফতেই। তিনি নিলেন অবকাশ, এখন আমাদের সে শখ কে মেটাবে?"

- "মেটাবে আমাদের খ্যাতি। তুমি কি ভেবেছ এতদিন ধরে আমরা কি কেবল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ালুম? মোটেই নয়, মোটেই নয়!

শৌখিন হলেও দেশ আর দশের কাছে আমরা এখন অপরিচিত নই। পুলিশে সুন্দরবাবু না থাকলেও আমাদের অলস হয়ে বসে থাকতে হবে বলে মনে করি না। ওই শোনো! সিড়িতে কোনো বৃহৎ মূর্তির পদশব্দ! বোধহয় নাম করতেই সশরীরে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব আসন্ন!"

ঠিক তাই! বিপুল ভুঁড়ির ভার নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ঘরে ঢুকেই সুন্দরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে একখানা চেয়ারের উপর ধুপ করে বসে পড়লেন এবং এই অনুচিত অতিরিক্ত ভারের বিরুদ্ধে চেয়ারখানা সশব্দে প্রতিবাদ করে উঠল!

মানিক সহাস্যে বললে, "ভো সুন্দরবাবু! আপনার নাম করার সঙ্গে-সঙ্গেই আপনি নিজে আবির্ভূত হয়ে ইংরেজি প্রবাদটার সত্যতা প্রমাণিত করলেন!"

মানিকের রসনাকে সুন্দরবাবু বরাবরই ভয় করে আসছেন। সন্দিগ্ধস্বরে বললেন, "হুম! কী প্রবাদ?"

"জানেন না? 'Talk of the devil and he will appear!' অর্থাৎ কিনা, দৈত্য-দানবের কথা তুললেই তার উদয় হয়!"

সুন্দরবাবু রেগে চোখ কটমট করে বললেন, "শুনলে তো জয়ন্ত, শুনলে তো? তোমার নচ্ছার দুর্মুখ বন্ধুর কথা শুনলে তো? আমি ডেভিল?"

মানিক বললে, "আহাহা, খামোকা খেপে যান কেন সুন্দরবাবু? 'ডেভিল' বলতে কেবল ভূত, অসুর, শয়তান বোঝায় না, পাজি, নরপিশাচ, বিশ্বাসঘাতককেও ডেভিল বলে।"

সুন্দরবাবু রুদ্ধরোষে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বললেন, "তাই নাকি? তাহলে তোমার মতে আমি ওর মধ্যে কোনটি?"

মানিক সুন্দরবাবুর নাগালের বাইরে সরে বসে বললে, "আবার নতুন কৌঁসুলি বা ব্যারিস্টারকেও ডেভিল নামে ডাকা হয়। এক রকম খাবারেরও নাম ডেভিল, তাও তো আপনার জানা আছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "তোমাকে আর শেখাতে হবে না, ডেভিল আমি অনেক খেয়েছি, মাংসের পুর দেওয়া ডিমের কথা কে না জানে!"

মানিক বললে, "উঁহু, সে ডেভিল নয়, এ হচ্ছে আর এক রকম খাবার, বোধহয় আপনি কখনও খাননি-আমাদের মধু রাঁধতে জানে।"

বরাবরের মতো আজও নতুন খাবারের নামে সুন্দরবাবুর ঘনীভূত ক্রোধ দ্রবীভূত হবার উপক্রম করলে। কারণ জয়ন্তদের খানসামা মধু যা রাঁধতে পারে, তিনিও যে তা ভোজন করতে পারেন, সে কথাটা ভোজনবিলাসী সুন্দরবাবুর অজানা ছিল না। বেশ-একটু নরম হয়ে তিনি বললেন, "খাবারটা কী শুনি?"

- "খুব মশলা দেওয়া ভাজা মাংস বলতেও ডেভিল বোঝায়। খাসা খাবার। আস্বাদ নেবার ইচ্ছা আছে নাকি? মধুকে ডাকব?"

এরপর আর ক্রোধ প্রকাশ করা মনুষ্যোচিত নয়। সুন্দরবাবু বিগলিত কণ্ঠে বললেন, "আহা, তা মন্দ কী?"

মানিক কত সহজে সুন্দরবাবুকে চটাতে ও পটাতে পারে তাই দেখে জয়ন্ত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

এমন সময়ে মধুর প্রবেশ।

সুন্দরবাবু আহ্লাদিত কণ্ঠে বলে উঠলেন-"এই যে মধু! ঠিক সময়েই এসেছ হে-স্বাগত, স্বাগত!"

এমন অভাবিত অভ্যর্থনার কারণ বুঝতে না পেরে মধু জিজ্ঞাসু চোখে জয়ন্তের দিকে তাকালে।

জয়ন্ত বললে, "মধু, তোমাকে দেখে সুন্দরবাবু বলছেন-স্বাগত, অর্থাৎ তোমার আগমন শুভ হোক। কেন, তা শুনতে চাও?"

মধু বললে, "তা শুনব না কেন? কিন্তু তার আগে বলে রাখি, একটি ছোকরাবাবু আপনার সঙ্গে জরুরি দরকারে দেখা করতে এসেছেন।"

- "ছোকরাবাবু? জরুরি দরকারে? কোথায়?"

- "নীচেয়। মস্ত একখানা মোটরগাড়ি করে এসেছেন। বড়োলোকের ছেলে-জামায় মুক্তোর বোতাম, হাতে সোনার ঘড়ি, আঙুলে সোনার আংটি।"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "শ্রীমধুসূদন, একনজরেই এতটা লক্ষ করে ফেলেছ? আমাদের সহবাসে তুমিও একটি ক্ষুদ্র গোয়েন্দা হয়ে উঠেছ দেখছি। যাও, বাবুটিকে উপরে পাঠিয়ে দাও।"

মধুর প্রস্থান। মানিকের মুখের পানে সুন্দরবাবুর হতাশভাবে দৃষ্টিপাত।

মানিক আশ্বাস দিয়ে বললে, "মাভৈঃ! মধু তো বাড়ি ছেড়ে পলায়ন করছে

না, যথাসময়েই আমাদের আরজি পেশ করব।"

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে একটি সুবেশী সুশ্রী যুবক, তার বয়স বাইশ-তেইশের বেশি হবে না, চোখের সপ্রতিভ দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায়, জনতার ভিতরেও সে নিজের স্বাতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়েই যুক্তকরে নমস্কার করে সে বললে, "আমি জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

জয়ন্ত বললে, "আমিই জয়ন্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার পরিচয় জানবার সুযোগ আমার হয়নি।"

যুবক বললে, "আপনি চন্দ্রনাথ অ্যান্ড কোম্পানির নাম শুনেছেন?"

- "শুনেছি বই কি! বিখ্যাত চা-ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান।"

- "কেবল চা নয়, আমাদের প্রতিষ্ঠান আরও অনেক কিছু নিয়ে কারবার করে। চন্দ্রনাথ আমার ঠাকুরদার নাম। বর্তমানে আমি সেই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মালিক। আমার নাম বীরেন্দ্রকুমার বাগচী।"

- "বসুন বীরেনবাবু। আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন?"

- "গোলকধাঁধায় পড়ে।"

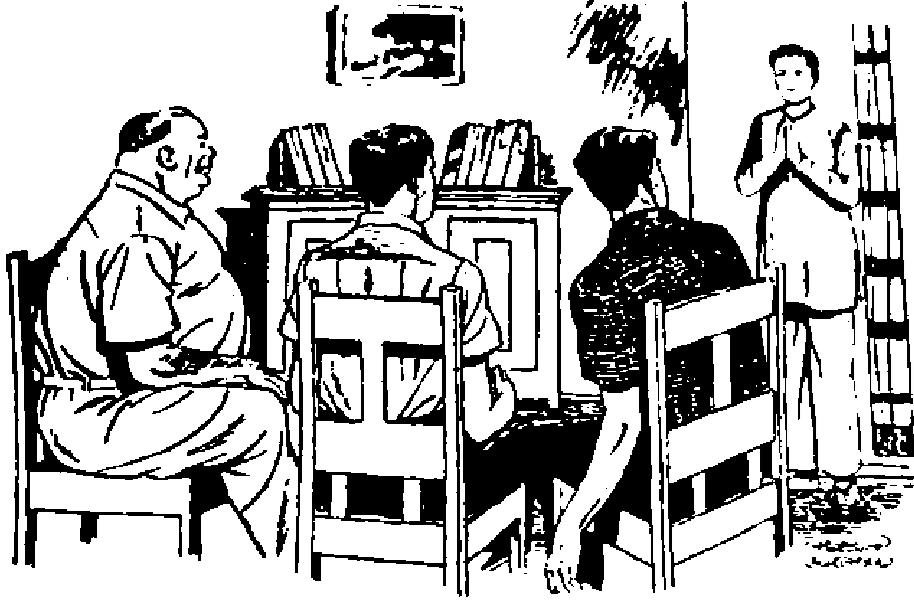
- "কী রকম?"

- "আমাদের বাড়িতে হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে, যার মধ্যে অর্থ বা অনর্থ কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ বেশ বুঝতে পারছি যে এর সঙ্গে আছে কোনো বিচিত্র রহস্যের সম্পর্ক!"

জয়ন্ত বললে, "বীরেনবাবু আপনি আমার কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করে তুললেন। বোঝা যাচ্ছে, যে ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন তা খুন বা ডাকাতি বা চুরি-চামারি নয়, কারণ ওদের মধ্যে অর্থ আর অনর্থ দুইই থাকে। কিন্ত রহস্যের সম্পর্কটা কোথায়, বুঝতে পারছি না।"

বীরেন মাথা নেড়ে বললে, 'আমিও পারছি না। তাই তো বললুম আমি গোলকধাঁধায় পড়েছি। শোনা আছে ধাঁধার জবাব দেওয়া আপনার পেশা-"

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, "ভুল বীরেনবাবু, ভুল! ধাঁধার জবাব দেওয়া আমার পেশা নয়, আমার নেশা-অর্থাৎ আমার শখ!"



- "বেশ, তাই! ভ্রম-সংশোধনের জন্যে ধন্যবাদ। এখন দয়া করে আমার কথা শুনবেন কি?"

- "নিশ্চয়ই! দয়া না করেও শুনব। বলুন আপনার কাহিনি।"

বীরেন চেয়ারের উপরে নড়েচড়ে ভালো করে বসে তার কাহিনি শুরু করলে:

- "কারবারের জন্য আমাকে কলকাতাতেই বাস করতে হয় বটে, কিন্তু আমার পৈতৃক বসতবাড়ি বা বাস্তুভিটা আছে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের অনতিদূরে। নবাবি আমলে তৈরি সেকেলে মস্তবড়ো বাড়ি, এখন সংস্কার অভাবে সদরমহল ছাড়া প্রায় সবটাই অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে। কালেভদ্রে আমাদের কারুর দেশে যাবার শখ হলে কেবল সদরমহলটাই ব্যবহার করা হয়, কাজেই সেদিকটায় মাঝে মাঝে রাজমিস্ত্রিদের হাত পড়ে। অন্য সময়ে সদরমহলও তালাবন্ধ থাকে। বাড়িখানা স্থানীয় এক ভদ্রলোকের জিম্মায় আছে-সম্পর্কে তিনিও আমাদের কুটুম্ব।

দিনদশেক আগে যদুনাথ বসু নামে এক ভদ্রলোক কলকাতার আপিসে আমার সঙ্গে দেখা করে জানালেন, মাসতিনেকের জন্য তিনি আমাদের দেশের বাড়ি ভাড়া নিতে চান।

আমি রাজি হলুম না। কিন্তু যদুবাবু অতিশয় জেদাজেদি করতে লাগলেন। বললেন তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা হিসাবে তিন মাসের দেড় হাজার টাকার

অগ্রিম ভাড়া আমার হাতে জমা দিতে প্রস্তুত আছেন। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, পাড়াগাঁয়ে একখানা সেকেলে বাড়ির জন্যে তিনি এত টাকা ভাড়া দিতে চান কেন?

তখন তার মুখ থেকেই জানতে পারলুম, তিনি হচ্ছেন পূর্ববঙ্গের জমিদার। চিকিৎসার জন্যে রুগ্ন মাকে নিয়ে কলকাতায় এসেছেন। চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছেন, মাকে নিয়ে যেতে মফস্‌সলের গঙ্গার ধারে কোনো জায়গায়।

আমাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে বটে, কিন্তু যুক্তিটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হল। কলকাতার আরও কাছে গঙ্গার ধারে তো কত ভালো ভালো বাড়ি রয়েছে। যাক, এসব নিয়ে আমি আর বেশি মাথা ঘামালুম না। এই লোভনীয় প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলুম। যদুবাবু আমাকে দেড় হাজার টাকার একখানা চেক দিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে গেলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে আর এক ব্যাপার! একখানা বেনামা চিঠি পেলুম। তাতে জানানো হয়েছে: প্রতাপ চৌধুরিকে যেন মুর্শিদাবাদের বাড়ি ভাড়া দেওয়া না হয়, সে সাংঘাতিক লোক।

সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলুম, বাড়ি ভাড়া নিয়েছে তো যদুনাথ বসু, কিন্তু কে প্রতাপ চৌধুরি? আর এই বেনামা চিঠিই বা কে লিখলে? কেন লিখলে? আমি যে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছি, এ কথাই বা সে কেমন করে জানতে পারলে?

তিন দিন পরে বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়! যেদিন চেক পেয়েছিলুম তার পরদিন থেকেই দুর্গাপূজার জন্যে ব্যাংক বন্ধ ছিল, চেক ভাঙাতে পারিনি। ব্যাংক খুললে পর জানতে পারলুম আমাকে একখানা ভুয়ো চেক দেওয়া হয়েছে, যদুনাথ বসুর নামে ব্যাংকে এক পয়সাও জমা নেই!

এভাবে ঠকে রেগে আগুন হয়ে আমি দেশে রওনা হলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলুম আমাদের বসতবাড়িতে জনপ্রাণী নেই। শুনলুম কয়েকজন গুণ্ডার মতো লোক সেখানে দু-দিন ধরে খুব হইহল্লা করে আবার কখন সরে পড়েছে কেউ তা জানে না।

বাড়ির একটা তালাবন্ধ ঘরে ঠাকুরদার আমলের কতকগুলো আসবাবপত্তর একালে অব্যবহার্য বলে গুদামজাত করা ছিল। সেই সঙ্গে একটা দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা প্রকাণ্ড আলমারির ভিতরে ছিল একগাদা সেকেলে কেতাব ও কাগজপত্র।

কারা তালা ভেঙে সেই ঘরে ঢুকে কেতাব ও কাগজপত্রগুলো বার করে ঘরময় ছড়িয়ে ফেলে রেখে গিয়েছে! নিশ্চয় যদুদেরই কীর্তি!

ঠাকুরদার হাতে লেখা একখানা ছেঁড়া খাতাও পেয়েছি। তাতেও সব অদ্ভুত কথা লেখা! বোধহয় ঠাকুরদার গল্প-টল্প লেখার অভ্যাস ছিল! খালি গল্প নয় পদ্যও!"

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

নরকঙ্কাল ও ভীষণ গর্জন

বীরেন চুপ করলে। জয়ন্তও স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, "ভারী গোলমেলে ব্যাপার তো! খামোকা যদু নামধেয় ব্যক্তির আবির্ভাব, অকারণে দেড় হাজার টাকা অগ্রিম দাদন দিয়ে তিন মাসের জন্যে একখানা পাড়াগাঁয়ে সেকেলে বাড়ি ভাড়া নেওয়া, ভুয়ো চেক ঘাড়ে চাপানো, তারপর দু-দিন সেই বাড়িতে কাটিয়েই ফুড়ুৎ করে হঠাৎ পলায়ন, এ সবই যেন মহা পাগলামির কাণ্ড! বীরেনবাবু, আপনি কোনো আস্ত পাগলের পাল্লায় পড়েছিলেন, এ নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করবেন না।"

মানিক বললে, "কিন্তু আমার মন কেমন খুঁত খুঁত করছে! সন্দেহ হচ্ছে এত সহজে ব্যাপারটা বোধহয় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কেন, তোমার সন্দেহের কারণ কী?"

- "যদুর দল তালা ভেঙে বাড়ির বন্ধ ঘরে ঢুকেছিল কেন? আলমারি থেকে কেতাবগুলো টেনে বার করেছিল কেন? নিশ্চয় তারা কিছু খুঁজছিল!"

জয়ন্ত বললে, "আমিও মানিকের কথায় সায় দি। যদু আলমারির ভিতরে হস্তচালনা করেছিল একটা কিছু খোঁজবার জন্যেই। কেবল আলমারি কেন, খুব সম্ভব সে বাড়ির অন্যান্য ঘরেও খোঁজাখুঁজি করতে ছাড়েনি।"

বীরেন বললে, “কিন্তু বাড়ির অন্যান্য ঘরে এমন কিছুই ছিল না, যা দেখে চোরের লোভ হতে পারে। আলমারির বইগুলো নিয়ে ছেলেবেলায় আমিও ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। তার মধ্যে ছিল বটতলায় ছাপা কতকগুলো সেকেলে বই- আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, চাহার দরবেশ, উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা প্রভৃতির সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত আর ওই শ্রেণির অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ আর তাড়া তাড়া বাজে কাগজপত্র। ব্যাস, আর কিছুই নয়!”

জয়ন্ত বললে, “ওই সঙ্গে আপনার ঠাকুরদার নিজের হাতে লেখা একখানা খাতাও ছিল বললেন না?”

- “হ্যাঁ, ছিল। ছেলেবেলায় সেকেলে জড়ানো হাতের লেখা পড়বার আগ্রহ হয়নি, সম্প্রতি পড়ে দেখেছি। খাপছাড়া খোশগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্প্রতি আরও একটা জিনিস লক্ষ করেছি। খাতাখানা আগে ছেঁড়া ছিল না, এখন দেখছি মাঝখান থেকে একখানা কাগজ কে ছিঁড়ে নিয়েছে।”

- “কী করে বুঝলেন?”

- “পত্রাঙ্ক দেখে।”

জয়ন্ত বললে, “সন্দেহজনক, সন্দেহজনক! বীরেনবাবু, খাতাখানা একবার দেখতে পেলে ভালো হত।”

নিজের হাতব্যাগের মধ্যে হস্তচালনা করে বীরেন বললে, “অনায়াসেই দেখতে পারেন। যদি কাজে লাগে এই ভেবে সে খানা আমি সঙ্গে করেই এনেছি”-এই বলে এক্সারসাইজ বুকের আকারে বাঁধানো একখানা পাতলা খাতা বার করে জয়ন্তের হাতে সমর্পণ করলে।

জয়ন্ত খাতাখানা খুলে আগাগোড়া পাতা উলটে প্রথমে ভাসা ভাসা চোখ বুলিয়ে গেল। টানা টানা জড়ানো লেখা, কিছু কষ্ট করে পড়তে হয়। সে বললে, “দ্যাখো মানিক, ৪০ পত্রাঙ্কে খাতা শেষ। বিষয়বস্তু দেখছি পাঁচ অংশে বিভক্ত। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা বা ভূমিকার মতো একটুখানি অংশ। তার পরের অংশের নাম দেওয়া হয়েছে ‘আভাস’। তৃতীয় অংশে কী ছিল জানবার উপায় নেই, ২১ থেকে ২৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছিড়ে নেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অংশের নাম ‘ইতিহাস’। পঞ্চম অংশে উপসংহার-একটি পুঁচকে পদ্য বা ছড়া। এখন আগে ভূমিকাটুকু

শোনো।"

জয়ন্ত পড়তে লাগল:



"যেখানে ঘটনাক্ষেত্র, তার নাম এখানে বলব না, লেখায় প্রকাশ করলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা। আমার সঙ্গী কৈলাস চৌধুরি এখন পরলোকে বটে, কিন্তু তার কুচরিত্র পুত্র ইহলোকে বিদ্যমান থেকে কেমন করে কিছু আভাস পেয়ে আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলেছে, এমনকি আমাকে ভয় দেখাতেও ছাড়ছে না। আমার একমাত্র ইচ্ছা, সমস্ত গুপ্তকথা জানবে কেবল আমার পুত্র! যদি সে কখনও অভাবে পড়ে, এই গুপ্তকথা তার কাজে লাগবে, তার দুশ্চিন্তা দূর করবে। অন্তিমকাল উপস্থিত হলে সমস্ত গুপ্তকথাই তার কাছে ব্যক্ত করব।

যদি সে সময় না পাই, তাহলেও আমার বিশেষ ভাবনার কারণ নেই। আমার পুত্র বুদ্ধিমান, তার জন্যেই তোলা রইল এই খাতাখানা। এই বিবরণ মন দিয়ে পাঠ করলেই সমস্ত রহস্য সে সমাধান করতে পারবে।"

পড়া থামিয়ে জয়ন্ত শুধোলে, "বীরেনবাবু, আপনার ঠাকুরদাকে আপনি দেখেছেন?"

- "আমার বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে ছায়া ছায়া মনে পড়ে মাত্র।"

- "আপনার বাবার মুখে আপনি এই খাতাখানার কথা শোনেননি?"

বীরেন সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, "বাবা? আমার বাবা পড়বেন গল্পের পাণ্ডুলিপি? মশাই, বাবাকে আমি জীবনে কোনো ছাপানো নভেলের পাতাই ওলটাতে দেখিনি! নিজের কারবারের বাইরে আর কোনো কথাই তাঁর মনে ঠাঁই পেত না।"

জয়ন্ত আবার কিছুক্ষণ ধরে চুপ করে কী ভাবতে লাগল। তারপর বললে, "আচ্ছা বীরেনবাবু, আপনার ঠাকুরদা মৃত্যুর আগে বা মৃত্যুশয্যায় আপনার বাবাকে এই খাতা সম্বন্ধে কোনো কথা বলে যাননি?"

সজোরে মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "কিছু না, কিছু না। মশাই, ওই খাতার ভিতরে ঠাকুরদার নিজের কোনো কথাই নেই, ওর সবটাই হচ্ছে ডাহা গালগল্প। আর মৃত্যুশয্যায় ঠাকুরদা কোনো কথা বলে যাবেন কী, মরবার সময়ে তিনি কোনো কথা বলবার অবসরই পাননি।"

- "তার মানে?"

- "তার মানে হচ্ছে, ঠাকুরদা তাস খেলতে খেলতে হঠাৎ বুকের অসুখে মারা পড়েছিলেন। খেলার আসর থেকে তুলে তার মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।"

জয়ন্ত নিজের রুপোর শামুকদানি থেকে একটিপ নস্য নিয়ে খুশি গলায় বললে, "খানিকটা আবছা কাটল বলে মনে হচ্ছে। হৃদরোগে হঠাৎ মৃত্যু, কোনো কথা বলাই সম্ভব হয়নি-বটে, বটে, বটে!"

বীরেন কৌতূহলী কণ্ঠে বললে, "আপনি কী বলতে চান জয়ন্তবাবু?"

জয়ন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, "আপাতত আপ কৌতূহল চরিতার্থ করবার সময় হয়নি। এখন খাতার দ্বিতীয় অংশে কী 'আভাস' পাওয়া যায় দেখা যাক।" সে আবার পাঠ শুরু করলে:

"বাল্যকালে আমার জীবনে ঘটেছিল একটি স্মরণীয় ঘটনা।

প্রতিবেশীদের মধ্যে আমার সবচেয়ে দহরম-মহরম ছিল কৈলাশ চৌধুরির সঙ্গে। সে ছিল আমার নিত্যসঙ্গী-খেলাধুলায় ও আহারে-বিহারে আমরা সর্বদাই মানিকজোড়ের মত একসঙ্গে থাকবার চেষ্টা করতুম।

কৈলাসের সঙ্গে একবার তার মাতুলালয়ে বেড়াতে গেলুম। জায়গাটা আমাদের বাড়ি থেকে দশ-বারো মাইল তফাতে। সেখানে আমরা হাটে-বাটে-মাঠে ছুটোছুটি করে, মার্বেল-ডাংগুলি খেলে ও গঙ্গার এপারে-ওপারে সাতার কেটে তিন দিন কাটিয়ে দিলুম মহা আনন্দে। তারপরেই ঘটল পূর্বোক্ত ঘটনা ।

গাঁয়ের প্রান্তে একটা মাঠে একদল ছেলে ফুটবল খেলছিল। এ দেশে ফুটবল খেলার রেওয়াজ তখন নতুন শুরু হয়েছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে খেলা দেখতে লাগলুম।

হঠাৎ এক বিপত্তি! মাঠের একদিকে গঙ্গাতীরে ছিল একখানা ভাঙাচোরা পোড়ো বাগানবাড়ি। এবং তার পিছনে ছিল একটা জলশূন্য পুরানো ইঁদারা। ফুটবলটা ঝুপ করে গিয়ে পড়ল একেবারে সেই ইঁদারার ভিতরে।

তখন আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে বিষন্ন হয়ে উঠেছিল চতুর্দিক। ইঁদারার ভিতরে নজর চলে না। ছেলের দল খানিক হইচই করে মাঠ ছেড়ে চলে গেল।

আমি বললুম, "কৈলাস, বলের জন্যে ওরা কাল সকালে নিশ্চয় আবার ফিরে আসবে। কিন্তু তার আগে আমরাই আজ কুয়োয় নেমে বলটাকে তুলে আনব।"

কৈলাস শিউরে উঠে বললে, "বাপ রে, এই অন্ধকারে? পাগল নাকি?"

চিরকালই সবাই আমাকে ডানপিটে ও বেপরোয়া বলে জানে। আমি কিন্তু একটুও দমলুম না, বললুম , "বেশ তোকে কুয়োয় নামতে হবে না, তুই খালি খানিকটা মোটা দড়ি আর একটা দেশলাই জোগাড় করে আন দেখি! তুই কেবল উপরে দাঁড়িয়ে থাকবি, কুয়োর ভিতরে নামব একলা আমিই। ফাঁকতালে একটা আস্ত ফুটবল লাভ, এমন সুযোগ ছাড়তে আছে!"

যেমন কথা, তেমনি কাজ। এল দড়ি ও দেশলাই। ভরসন্ধ্যাবেলায় দড়ি বেয়ে নেমে গেলুম ইঁদারার গহ্বরে।

ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। পায়ের তলায় কী কতকগুলো খড়মড় খড়মড় করে উঠল। দেশলাইয়ের প্রথম কাঠি জ্বেলে খালি এইটুকু দেখলুম, ইঁদারার গায়ে গাঁথা রয়েছে একজোড়া হাতলওয়ালা লোহার দরজা। তারপর কাঠি নিভে গেল।

দ্বিতীয় কাঠি জ্বেলে নীচের দিকে তাকিয়েই সচমকে দেখি কতকগুলো মাংসহীন



নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে আমার পায়ের তলায়। তারপর আলো নেবার সঙ্গে সঙ্গেই শুনলুম যেন কোনো অপার্থিব বিভীষণের মারাত্মক ফোঁসফোঁসানি!

সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে হল পরমুহূর্তেই সেই ভয়াবহ বিষাক্ত হিস হিস শব্দ যেন আমার চোখের সামনেই মূর্তিমান হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে! কর্পূরের মতো উবে গেল আমার সমস্ত সাহস, দারুণ আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে প্রাণপণে দড়ি ধরে কোনোরকমে উপরে এসে উঠলুম।

সব শুনে কৈলাস চোখ কপালে তুলে বললে, “চুলোয় যাক ফুটবল! ওখানে আছে গুপ্তধন আর যকের পাহারা! গুপ্তধনের লোভে ওখানে গিয়ে যকের হাতে যারা মারা পড়েছে, তুই দেখেছিস তাদেরই কঙ্কাল!”

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

জগৎশেঠের গুপ্তধন

জয়ন্ত বললে, “খাতার দ্বিতীয় অংশ শেষ হল। তৃতীয় অংশ আমাদের হাতে নেই। চতুর্থ অংশের নাম ‘ইতিহাস’। এইবারে সেটুকু পাঠ করা যাক।”

আবার পড়া শুরু হল:

“সারা পৃথিবীকে যিনি ঋণদান করতে পারেন, তারই উপযোগী উপাধি হচ্ছে ‘জগৎশেঠ’। দিল্লির সম্রাট মহম্মদ শাহ ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে ওই উপাধি দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের মহাজন ফতেচাঁদকে।

কিন্তু ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হলেও বাঙালি ছিলেন না। তার পূর্বপুরুষ হিরানন্দ শাহা সুদূর রাজস্থান থেকে পাটনায় এসে ব্যবসায় শুরু করেন এবং তেজারতি কারবারে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হন।

হিরানন্দের সাত ছেলে। তাঁদের একজনের নাম মানিকচাঁদ। তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবার জন্যে বাংলার তখনকার রাজধানী ঢাকায় গিয়ে হাজির হন এবং নবাব-দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। পরে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ পশ্চিমবঙ্গে এসে ভাগীরথীতটে নতুন রাজধানী স্থাপন করে নিজের নামানুসারে তার নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ। নবাবের প্রিয়পাত্র মানিকচাঁদও নতুন রাজধানীতে এলেন। নবাব দরবারে তাঁর প্রভাব ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে। তাঁর পরামর্শে মুর্শিদাবাদে নবাবি টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি হন নবাবের অর্থসচিব ও কোষাধ্যক্ষ। ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির বাদশাহ তাঁকে ‘শেঠ’ উপাধি দান করেন।

এই মানিকচাঁদের বংশধররা পরে কেবল নবাব-বংশের নয়, স্বাধীন বাংলা দেশেরও উত্থান ও পতনের অন্যতম কারণরূপে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

মানিকচাঁদ ছিলেন অপুত্রক। ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেচাঁদ হন তাঁর দত্তকপুত্র। তিনি

দিল্লিতে থেকে অংশীদাররূপে কারবার দেখতেন। কিন্তু ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মানিকচাঁদের মৃত্যু হলে তিনিও মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। এর দুই বৎসর পরেই তিনি জগৎশেঠরূপে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ধনিক বা পুঁজিপতি বলে সুপরিচিত হন। মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর (১৭২৭ খ্রিঃ) পর সুজাউদ্দিন নবাব হয়ে ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়টাই হচ্ছে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের জীবনে সবচেয়ে গৌরব ও সৌভাগ্যের যুগ। তিনি কেবল সুবিপুল ধনাগারের অধিকারী ছিলেন না, নবাব-দরবারে ও দেশ-বিদেশে তাঁর সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিও ছিল অতুলনীয়। কিন্তু সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে সরফরাজ খাঁর সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই জগৎশেঠকে প্রথম ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে হল।

তরুণ নবাব সরফরাজ ফতেচাঁদের পুত্রবধূর অসীম রূপলাবণ্যের কথা শুনে নির্বোধের মতো তাঁকে স্বচক্ষে দেখবার বাসনা প্রকাশ করলেন, এটুকু তাঁর খেয়াল এল না যে, হিন্দুদের অসূর্যম্পশ্যা কুলললনার পক্ষে সেটা হচ্ছে অতিশয় অপমানকর প্রস্তাব!

ফতেচাঁদ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে আলিবর্দি খাঁয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন এবং তার ফলে গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সরফরাজের মৃত্যু ও ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে আলিবর্দির সিংহাসনপ্রাপ্তি।

এই ঘটনার চার বৎসর পরে ফতেচাঁদ ইহলোক ত্যাগ করলেন। তার দুই পৌত্র-মাধব রায় ও স্বরূপচাঁদ। মাধব রায় জগৎশেঠ উপাধির সঙ্গে বেশির ভাগ সম্পত্তির অধিকারী হলেন এবং বাকি সম্পত্তির সঙ্গে স্বরূপচাঁদ নবাব-দরবার থেকে পেলেন 'রাজা' উপাধি। বাংলা দেশে তখন ইংরেজ ও ফরাসিরাও প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করছিলেন, সুচতুর জগৎশেঠরা তাঁদেরও লক্ষ লক্ষ টাকা ধার দিয়ে তুষ্ট রাখতে ভুললেন না। এইভাবে সব দিক সামলে ব্যাবসা চালিয়ে তাঁরা দিনে দিনে অধিকতর আর্থিক উন্নতির পথে এগিয়ে চললেন।

তারপরেই আলিবর্দির মৃত্যু ও ১৭৫৬ খিস্টাব্দে সিরাজের সিংহাসন লাভ এবং তাঁর সঙ্গে জগৎশেঠের বিরোধ। নূতন নবাবের কাছে অপমান ও লাঞ্ছনা লাভ করে জগৎশেঠ আবার মীরজাফর ও ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ফল, পলাশির যুদ্ধ ও সিরাজের পতন এবং বাংলার সর্বনাশ।

জগৎশেঠরা আবার পূর্বগৌরবের পদে উন্নীত হয়ে নিজেদের স্বর্ণভাণ্ডারের পরিধি আরও বাড়িয়ে তুললেন বটে, কিন্তু তখনই ভিতরে ভিতরে তাঁদের উপরে শনির দৃষ্টি পড়তে শুরু হল। তারপর অকর্মণ্য মীরজাফরকে বঞ্চিত করে ইংরেজরা ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যের ভার অর্পণ করলেন মীরকাশিমের হস্তে। নতুন নবাবকে নিয়ে জগৎশেঠরা সুখী হতে পারলেন না, তাঁরা আবার চক্রান্তে যোগ দিলেন। কিন্তু এবারে তাঁরা আর শেষ রক্ষা করতে ও নিয়তিকে ফাঁকি দিতে পারলেন না, বিপদ ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে দেখে মীরকাশিম তাঁদের বন্দি করে ফেললে (১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে)। তাঁদের বন্ধু ইংরেজদের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা আর মুক্তি লাভ করতে পারলেন না।

তারপর উদয়নালার যুদ্ধ; মীরকাশিমের পরাজয় এবং জগৎশেঠ ও অন্যান্য বন্দিদের নিয়ে মীরকাশিমের মুঙ্গেরে প্রস্থান; বক্সারের যুদ্ধ; মীরকাশিমের শেষ পরাজয় (১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে) এবং জগৎশেঠ প্রভৃতিকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করে হত্যা।

মীরজাফর আবার বাংলার নবাব হন এবং নতুন জগৎশেঠ কুশলচাঁদও (নিহত জগৎশেঠ মাধব রায়ের বড়োছেলে) আবার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। তিনিও ইংরেজদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য লাভ করেও শেঠবংশের পূর্বগরিমা আর ফিরিয়ে আনতে পারেননি। বাংলার ভুয়ো নবাবির সঙ্গে জগৎশেঠদেরও জাঁকজমক ম্লান হয়ে এসেছিল, বাংলার স্বাধীনতাহরণে সাহায্য করে তাঁরাও আত্মরক্ষা করতে পারলেন না।

বুদ্ধিমান কুশলচাঁদ বুঝে নিয়েছিলেন যে, জগৎশেঠদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়-তাঁদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। দুঃসময়ের জন্যে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন। তাঁর আদেশে একটি গুপ্তকুঠি নির্মিত হল এবং নিজের সম্পত্তির কতক অংশ তিনি সেইখানে লুকিয়ে রাখলেন।

সেই রত্নকুঠির কাহিনী আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে, কিন্তু তার ঠিকানা কেউ জানে না। কুশলচাঁদ হঠাৎ মারা পড়েন, তাই গুপ্তধনের সন্ধান নিজের উত্তরাধিকারীর কাছে দিয়ে যেতে পারেননি।

শেষ পর্যন্ত কুশলচাঁদ যা ভয় করেছিলেন তাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমেই শেঠদের অর্থ ও প্রতিপত্তি কমে এলেও কুশলচাঁদের মৃত্যুর পর আরও দুইজন জগৎশেঠের নাম শোনা যায়-হারেকচাঁদ ও ইন্দ্রচাঁদ।

ইন্দ্রচাঁদের পুত্র গোবিন্দচাঁদ 'জগৎশেঠ' উপাধি থেকেও বঞ্চিত হন এবং পিতার সম্পত্তিও বোকার মতো দুই হাতে উড়িয়ে দিয়ে ইংরেজের অন্নদাসরূপে শেষ-জীবন কাটাতে বাধ্য হন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাসকেও দেশদ্রোহী জগৎশেঠদের কাছে উপকৃত ইংরেজরা বৃত্তি দান করতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে বৃত্তিও বন্ধ হয়।

জগৎশেঠের আধুনিক বংশধররাও মুর্শিদাবাদে বাস করেন, কিন্তু লুপ্ত হয়েছে তাঁদের আর্থিক গৌরব। হয়তো তাঁরাও প্রবাদে গুপ্তধনের কাহিনী শ্রবণ করেন, কিন্তু তার সত্যতা নিরূপণ করবার উপায় তাঁদের হাতে নেই-আবিষ্কার করতে পারলে এখন এ গুপ্তধনের মালিক হবে যে কোনো ব্যক্তি।"

জয়ন্তের পাঠ সাঙ্গ হল। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! সব তো শোনা হল! খানিকটা ভণিতা, খানিকটা গালগল্প, খানিকটা গাঁজা-মেশানো ইতিহাস! বীরেনবাবু ঠিকই ধরেছেন-তাঁর ঠাকুরদার গল্প বানানোর অভ্যাস ছিল!"

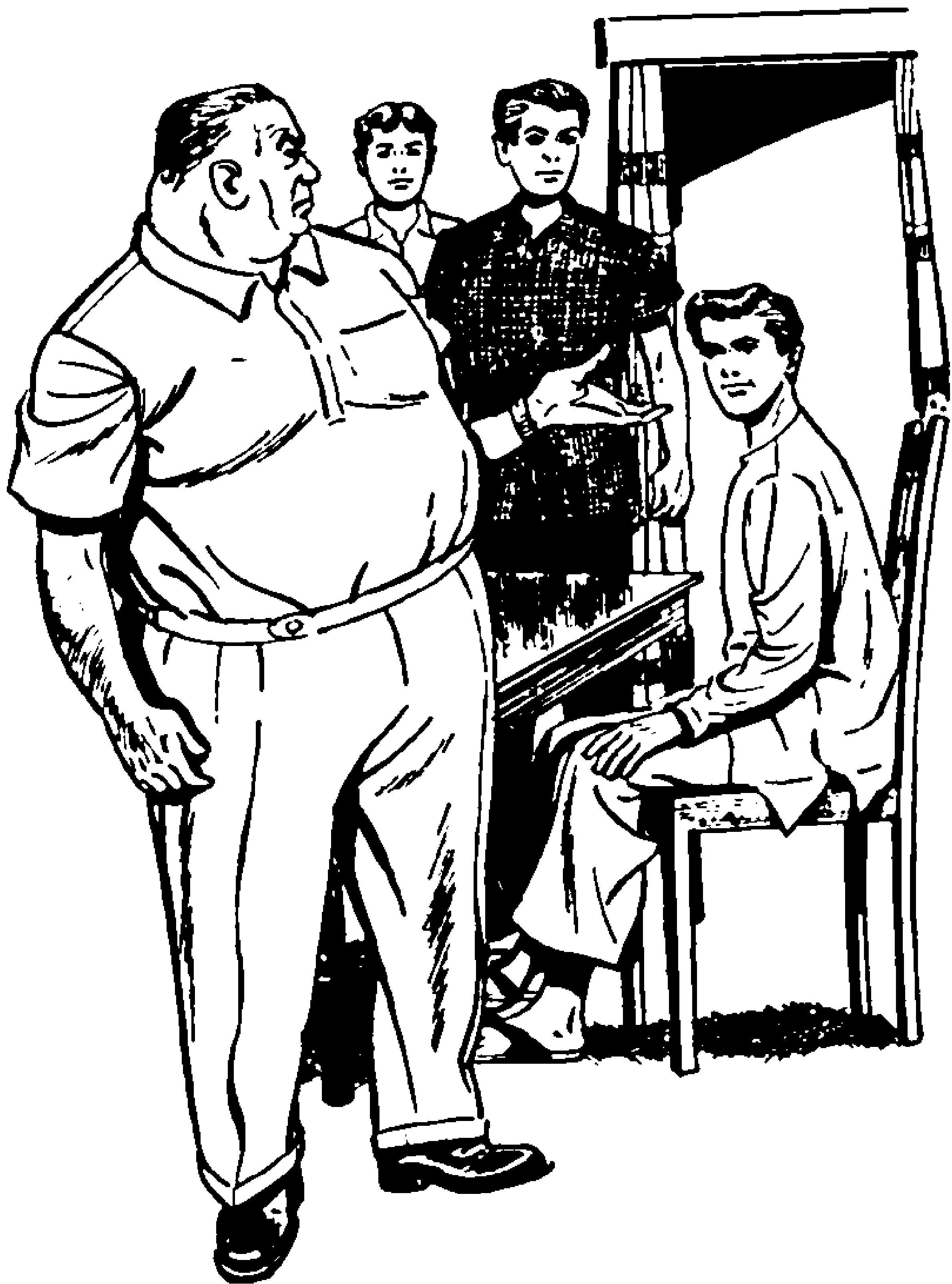
জয়ন্ত বললে, "উপসংহারে একটি পদ্যও আছে, সেটাও চেঁচিয়ে পড়া যাক!" বলে সে পড়তে লাগল:

বোকায় ধোঁকা দেবার তরে বুদ্ধিসাগর মন্থি'
গোলকধাঁধার গ্রন্থ রচি আমি নতুন গ্রন্থী।
কিন্তু আমি ঠিক জানি তাই,
গুপ্তপথে রপ্ত সবাই!
সর্বজনের সামনে লুকোয় সহজ পথের পন্থী।
বিন্দু বারি সিন্ধু হলে যায় না দেখা বিন্দুকে,
ইন্দু আছে মেঘের আড়ে, নিন্দে তবু নিন্দুকে।
মানসনয়ন যে খুলে চায়
সত্য মানিক সেই খুঁজে পায়,
মূর্খ শুধু রত্ন খোঁজে মস্ত লোহার সিন্দুকে!

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "এ যে বাবা দস্তুরমতো হেঁয়ালি!"

বীরেন বললে, "প্রায় অতি-আধুনিক কবিতার মতো!"

মানিক বললে, "খাপছাড়া পদ্য-টদ্য নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাবার দরকার নেই। জয়ন্ত, তুমি কী মনে করো, বীরেনবাবুর দেশের বাড়িতে যে রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে, তার সঙ্গে এই খাতার লেখার কোনো সম্পর্ক আছে?"



জয়ন্ত বললে, "এইবারে তাই নিয়েই আলোচনা করতে হবে।"



মধু একখানা খাম হাতে করে ঘরে ঢুকে বললে, “বাবু একটা অদ্ভুত লোক এসে আপনার নামে এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।”

- “অদ্ভুত লোক?”

- “হ্যাঁ বাবু। পরনে সন্ন্যাসীর মতো গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়িগোঁফ!”

জয়ন্ত খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়েই লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, “কোথায় সে?”

- “বাবু, চিঠিখানা আমার হাতে গুঁজে দিয়েই সে হনহন করে চলে গেল!”

চিঠিতে কেবল লেখা ছিল, “সাবধান, সাবধান, সাক্ষাৎ শয়তান প্রতাপ চৌধুরিকে সাবধান।”

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

কে প্রতাপ চৌধুরি?

মানিক বললে, "কী আশ্চর্য! কে এই সাক্ষাৎ-শয়তান প্রতাপ চৌধুরি? বার বার তার কথা তুলে আমাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে কেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আরও একটা অদ্ভুত প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই অদ্ভুত লোকটা? পরনে সন্ন্যাসীর মতো গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়িগোঁফ!"

বীরেন বললে, "আমার বিশ্বাস এই লোকটাই বেনামা চিঠি লিখে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল!"

জয়ন্ত বললে, "এই গেরুয়াবস্ত্রধারী রহস্যময় লোকটা কে তা জানিনা, কিন্তু প্রতাপ চৌধুরি সম্বন্ধে হয়তো কিছু আন্দাজ করতে পারি।"

বীরেন বললে, "পারেন নাকি?"

- "হ্যাঁ। আমার আন্দাজ হয়তো মিথ্যা নয়। আপনার ঠাকুরদা চন্দ্রনাথবাবুর লেখা পড়ে আমরা জেনেছি যে, তিনি যখন ইঁদারায় নেমেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন কৈলাস চৌধুরি। আর এক জায়গায় তিনি বলছেন, কৈলাস চৌধুরির কুচরিত্র পুত্র গুপ্তরহস্যের আভাস পেয়ে তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছে আর ভয় দেখাচ্ছে। খুব সম্ভবত তারই নাম প্রতাপ চৌধুরি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু গুপ্তরহস্যটা কী?"

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বললে, "জগৎশেঠের রত্নকুঠি।"

- "আরে ধেৎ, তুমিও কি ওই রূপকথাটা বিশ্বাস করো?"

- "করি। জগৎশেঠ কুশলচাঁদের গুপ্তধনের কথা আমিও ঐতিহাসিক কাহিনিতে পাঠ করেছি।"

- "ইতিহাস আর কাহিনি এক কথা নয়।"

- "তা নয়। কিন্তু সেকালের ধনীদের মধ্যে গুপ্তধন রাখার প্রথাটা খুবই চলিত ছিল। আর বীরেনবাবুর ঠাকুরদার লেখা পড়লে এই সন্দেহই দৃঢ় হয় যে, তিনি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিলেন। তা নইলে তিনি এ কথা বলতেন না যে, লেখার মর্মোদ্ভেদ করতে পারলে তাঁর পুত্রের অর্থাভাব দূর হয়ে যাবে।"

মানিক বললে, “ধরলুম কৈলাস চৌধুরির ছেলেরই নাম হচ্ছে প্রতাপ চৌধুরি। হয়তো সত্য-সত্যই তার চরিত্র হচ্ছে সাক্ষাৎ শয়তানের মতো ভয়াবহ। কিন্তু তার সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে কেন? এ মামলাটা নিয়ে এখনও আমরা তদন্তে নিযুক্ত হইনি। সে আমাদের অস্তিত্ব জানতে পারবে কেমন করে?”

জয়ন্ত শুধোলে, “বীরেনবাবু, আপনি যে আমাদের সাহায্য গ্রহণ করতে চান, এ কথা কি আর কারুর কাছে প্রকাশ করেছেন?”

বীরেন সবেগে মাথা নেড়ে বললে, “নিশ্চয়ই নয়! আজ সকাল পর্যন্ত জানতুম না যে, আমি আপনাদের কাছে এসে ধরনা দেব!”

- “তাহলে অন্য কোনো পক্ষের লোক আপনার পিছনে পিছনে ছায়ার মতো লেগে আছে। আপনি যে আমাদের কাছে এসেছেন, এর মধ্যেই সে খবর তারা পেয়ে গেছে। জানেন তো, অপরাধীদের কাছে আমরা অপরিচিত নই?”

বীরেন বললে, “এ কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কারা তারা?”

- “হয়তো তথাকথিত যদুনাথ বসুর দল। হয়তো যদুনাথ হচ্ছে প্রতাপ চৌধুরিরই ছদ্মনাম!”

মানিক বললে, “যদুনাথ বসু বা প্রতাপ চৌধুরির কথা বলতে পারি না, তবে এমন আর একজন লোকও বীরেনবাবুর প্রত্যেক গতিবিধির খবর রাখে, যে প্রতাপ চৌধুরির বন্ধু নয়।”

জয়ন্ত বললে, “তুমি বেনামা পত্রলেখকের কথা বলছ?”

- “হ্যাঁ।”

- “আমিও তোমার মতে সায় দি। আমরা এখনও কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইনি, কিন্তু ব্যাপারটা যে গোড়াতেই অতিরিক্ত মাত্রায় ঘোরালো হয়ে উঠল! আপাতত আমাদের এই প্রতাপ চৌধুরি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বীরেনবাবু, আপনি প্রতাপ চৌধুরিকে চেনেন?”

- “না। তবে লোকের মুখে শুনেছি, চুরি, জুয়াচুরি, রাহাজানি, খুনখারাবিতে সে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। একবার কোথায় কী অপরাধ করে সে পনেরো বছরের জন্যে জেলে গিয়েছিল, কিন্তু বছরখানেক যেতে না যেতেই জেল ভেঙে পালিয়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে আছে।”

সুন্দরবাবু হঠাৎ টেবিলের উপরে প্রচণ্ড জোরে এক ঘুসি বসিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "জয়ন্ত! মানিক! এই সেই 'সোনার আনারস' মামলার প্রতাপ চৌধুরি নয় তো? আমরাই তাকে গ্রেপ্তার করেছিলুম, পনেরো বৎসর কারাবাসের আদেশ পেয়ে এক বছরের মধ্যেই জেল থেকে সে পালিয়ে যায় আর সঙ্গে করে নিয়ে যায় তার দলের আর-একজন লোককেও।"

মানিক বললে, "তারও নাম মানিকচাঁদ। সে-ও এক মারাত্মক অপরাধী, আমাদের প্রায় মৃত্যুপথে পৌঁছে দিয়েছিল, সুন্দরবাবুর জন্যে কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি!"



জয়ন্ত বললে, "হুঁ, সব মনে পড়ছে! প্রতাপ চৌধুরি সেই সময়েই আমাকে বলেছিল, কোনো কারাগারই তাকে ধরে রাখতে পারবে না, তার সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে।"

মানিক বললে, "ও বাবা, সে যে এক মহা ধড়িবাজ ব্যক্তি! সেবারে তার হাত থেকে আমরা বাঘরাজাদের গুপ্তধন ছিনিয়ে নিয়েছিলুম। গ্রেপ্তার হবার পর সে আমাদের

বলে গিয়েছিল-'আপাতত এই গুপ্তধন তোমাদের জিম্মায় রেখে গেলুম। যথাসময়ে এর সঠিক হিসাব দাখিল করতে হবে।' এখন সে জেলের বাইরে এসেছে। এইবারে আবার কি তার দেখা পাব?"

জয়ন্ত বললে, "সে আবার দেখা দেবে কি দেবে না জানি না। কিন্তু সে যদি এই প্রতাপ চৌধুরি হয়, আর আমরা যদি বীরেনবাবুর মামলার ভার গ্রহণ করি, তাহলে আমাদেরই তাকে খুঁজে বার করতে হবে।"

সুন্দরবাবু মস্তক আন্দোলন করে বললেন, "হুম! সে বুঝি সহজ কথা? গেলবারেই দেখেছি, প্রতাপ চৌধুরিটা মেঘনাদের মতো আড়াল থেকে এমন কায়দায় যুদ্ধচালনা করে যে, কেউ তাকে ধরতে-ছুঁতে পারে না!"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু তার যুদ্ধচালনার কৌশলটা আমরা জেনে নিয়েছি, সুতরাং এবারে আর বেশি বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না।"

আচম্বিতে সকলকে চমকে দিয়ে রাস্তার ধারের জানলার গরাদের উপরে ঠকাং করে কী-একটা এসে পড়ে ছটকে গেল অন্য দিকে এবং পরমুহূর্তে জেগে উঠল কামানগর্জনের মতো একটা কানফাটানো ভীষণ শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে থরথর করে বাড়িঘর কাঁপতে লাগল! হু হু করে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সমস্ত দৃশ্য! সম্মিলিত কণ্ঠে তীব্র আর্তনাদ! জনতার উচ্চ কোলাহল! এ যেন পরম শান্তির মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাত!

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

হোটেলখানায় সন্ন্যাসী

এই অভাবিত ও আকস্মিক উৎপাত স্তম্ভিত করে দিলে সকলের দেহ এবং মন। জানালা দিয়ে হু হু করে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল বারুদের গন্ধমাখা রাশিকৃত ধোঁয়া, সকলে ফ্যালফ্যাল করে সেইদিকে তাকিয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো।

বাইরের থেকে সামনে ভেসে আসছে আর্তনাদ, হট্টগোল, বহু লোকের দ্রুত পদশব্দ।

কে চিৎকার করে বললে, "শিগগির ফোন করে দাও! অ্যাম্বিউল্যান্সের ব্যবস্থা করো!"

সর্বাগ্রে নিজেকে সামলে নিলে জয়ন্ত। দৌড়ে জানালার কাছে ছুটে গিয়ে পথের দিকে করলে দৃষ্টিপাত। এদিকে-ওদিকে চোখ ঝুলিয়ে নিয়ে বললে, "বোমা! আমাদের জানালা লক্ষ্য করে কেউ বোমা ছুড়েছে!"

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বলে উঠলেন, "হুম! হুম! হুম!"

- "কিন্তু আমাদের জোর কপাল। বোমাটা ঘরের ভিতরেও আসেনি, জানালার গরাদের গায়ে ধাক্কা লেগেও তার বিস্ফোরণ হয়নি, পথের উপরে আছড়ে পড়বার পর সেটা ফেটে গিয়েছে!"

মানিক বললে, "এই বন্ধ ঘরের ভিতরে বোমা ফাটলে আমরা কেউ আর বাঁচতুম না!"

- "তা হয়তো বাঁচতুম না। কিন্তু তা হয়নি বলে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।"

সুন্দরবাবু রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু কৃষ্ণ যাদের রক্ষা করলেন না, তাদের অবস্থাটা দেখে আসা দরকার। চলুন, নীচেয় নেমে তদারক করে আসি।"

রাজপথের উপরে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে রক্ত আর রক্ত! এখানে-ওখানে বইছে যেন রক্তের রাঙা লহর! তারই মধ্যে ছটফট করছে তিনটে রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন দেহ। আর একটা দেহ একেবারে আড়ষ্ট ও নিস্পন্দ। সে বীভৎস দৃশ্য চোখ মেলে দেখা যায় না-বীরেন শিউরে উঠে 'উঃ' বলে হাতে চোখ ঢেকে মাটির উপরে বসে পড়ল।

রাজপথের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "দ্যাখো জয়ন্ত, দ্যাখো! বোমা ফেটে পথের উপরে কত বড়ো একটা গর্ত হয়েছে-ওরে বাস রে বাস!"

মানিক বললে, "অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা!"

জয়ন্ত বলে, "কিন্তু ছুড়লে কে, সেইটেই এখন জানা দরকার।"

পথে লোকে লোকারণ্য, ছুটোছুটি, ভীত চিৎকার! কেউ স্থির হয়ে কারুর কথা শুনছে না, নানাজনে নানাপ্রকার মত জাহির করছে!

ওধারের ফুটপাতে ছিল একখানা চায়ের দোকান, জয়ন্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বললে, "হ্যাঁ স্যার, ব্যাপ আমি দেখেছি! একখানা ছুটন্ত মোটর থেকে একটা লোক

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আপনার বাড়ির দোতলার জানালার দিকে বলের মতো একটা জিনিস ছুড়ে মারলে-”

সুন্দরবাবু বাধা দিয়ে বললেন, “কীরকম মোটর? ট্যাক্সি?"

- “না, লাল রঙের প্রাইভেট মোটর।”

- “সিডান বডি?”

- “না, খোলা গাড়ি।”

- “নম্বর?”

- “আরে মশাই, নম্বর দেখবার সময় কি পেয়েছি? তারপরেই ভীষণ শব্দ আর বিষম হুলুস্থুল-আঁতকে উঠে সেইদিকেই তাকিয়ে রইলুম।”

- “তুমি তো ভারী বোকা লোক হে! কেন তুমি আঁতকে উঠলে, কেন তুমি নম্বরটা টপ করে দেখে নিলে না?”

- “মশাই গো, এখানে থাকলে আপনিও তখন আমারই মতন বোকামি করতেন!”

- “কক্ষনো নয়, কক্ষনো নয়, আমি সে পাত্রই নই!”

জয়ন্ত বললে, “যাক গে ও-কথা। তারপর কী হল বলো।”

- “তারপর মুখ ফিরিয়ে সেই লাল মোটরখানা আর দেখতে পেলুম না। গাড়িখানা একবারও থামেনি, তিরের মতো ছুটে মিলিয়ে গিয়েছে।”

সুন্দরবাবু গজগজ করে বললেন, “যাবেই তো, মিলিয়ে যাবেই তো! নম্বর দেখবে বলে সে তো আর দাঁড়িয়ে থাকবে না!”

চায়ের দোকানের মালিক হঠাৎ সচমকে বলে উঠল, “দেখুন, দেখুন!”

- “দেখব? কী দেখব?”

- “সেইরকম একখানা লাল মোটর আবার এইদিকে ছুটে আসছে!”

- “হুম, বলো কী?”

- “না, না, গাড়িখানা খানিকটা এসেই আবার মোড় ফিরে পাঁই পাঁই করে সরে পড়ল!”

সুন্দরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, “ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!”

মানিক বললে, "মিছে চেঁচিয়ে গলা ভাঙবেন কেন সুন্দরবাবু? কোথাও ট্যাক্সি নেই, লাল মোটরের পিছু ধরা অসম্ভব!"

বীরেন বললে, "হ্যাঁ, লাল মোটরখানা আড়ালে চলে গেছে-আর ওর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়।"

সুন্দরবাবু বললেন, "ফাঁকি দিলে যে, ফাঁকি দিলে! হায় হায় হায় হায়!"

জয়ন্ত বললে, "দূর থেকে কারুকে চিনতে পারলুম না বটে, তবে এটুকু আমার চোখ এড়ায়নি যে, গাড়ির ভিতরে ছিল তিনজন আরোহী আর তাদের একজনের দেহে ছিল সাহেবি পোশাক।"

- "কিন্তু জয়ন্ত, ওখানা বোধহয় অপরাধীদের গাড়ি নয়। তাহলে পালিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসত না।"

- "গাড়িখানা সন্দেহজনক। নইলে এইদিকে আসতে আসতে হঠাৎ অন্য পথ ধরে এত তাড়াতাড়ি সরে পড়ল কেন?"

মানিক বললে, "আমার বোধ হয় অপরাধীরা দেখতে এসেছিল তাদের বোমা লক্ষ্যভেদ করেছে কি না!"

- "আমারও সেই বিশ্বাস। তারপর ঘটনাস্থলে আমাদের বহাল তবিয়তে বর্তমান দেখে চটপট চম্পট দিয়েছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কী দুঃসাহসী অপরাধী!"

- "এই মামলার সঙ্গে ফেরারি আসামি প্রতাপ চৌধুরির কোনো সম্পর্ক আছে কি না জানি না, কিন্তু তার দুঃসাহসের প্রমাণ আগেও কি আপনি পাননি সুন্দরবাবু?"

সুন্দরবাবু সায় দিয়ে বললেন, "পেয়েছি বই কি, পেয়েছি বই কি! ওই দ্যাখো, পুলিশ এসে পড়েছে-সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বিউল্যান্সের গাড়িও!"

জয়ন্ত বললে, "আসুন, আমরা চুপি চুপি সরে পড়ি।"

- "কিন্ত সরে পড়বে কোথায়? বোমা ছুড়েছে তোমার বাড়ির উপরে, পুলিশ তোমাকে খুঁজবেই।"

- "সে সব পরের কথা। এখন আর-একটা দৃশ্য দেখুন।"

- "দৃশ্য? আবার কী দৃশ্য?"

- "চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। একটু দূরে তাকিয়ে দেখুন, আমাদের পাড়ায় হোটেলবাড়ির ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে এক বিচিত্র মূর্তি! পরনে গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়িগোঁফ। এই লোকটাই কি খানিক আগে মধুর হাতে বেনামা চিঠি সমর্পণ করে গেছে?"

- "হুম!"

- "আচ্ছা, আমি খবরাখবর নিয়ে আসি, আপনারা বাড়ির ভিতরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।" এই বলে জয়ন্ত দ্রুতপদে অগ্রসর হল।

।। ষষ্ঠ অধ্যায় ।।

উদরপরায়ণ সন্ন্যাসীপ্রবর

মানিক ও বীরেনকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দরবাবু আবার জয়ন্তের বৈঠকখানায় ঢুকে একখানা চেয়ারের উপরে নিজের গুরুভার কলেবর-স্থাপন করলেন সশব্দে।

এবং তারপর গলা চড়িয়ে বললেন, "ও মধু, অ শ্রীমধুসূদন! মনটা বড়োই উত্তেজিত হয়েছে বাবা, এক পেয়ালা চা না পেলে তো শান্ত হবে না!"

কিন্তু চায়ের পেয়ালা আসবার আগেই সেখানে হল পুলিশের আবির্ভাব। স্থানীয় থানার ইনস্ত তদন্তে এসে সুন্দরবাবুকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললেন, কিন্তু আসল রহস্যের কোনোই পাত্তা পেলেন না, তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হল কেউ বা কারা ভ্রমক্রমে এই বাড়ির উপরে বোমা নিক্ষেপ করেছে।

পুলিশ প্রস্থান করলে পর মানিক বললে, "সুন্দরবাবু, এইবারে চা আসবে তো?"

- "নিশ্চয়! সেইসঙ্গে কিছু 'ইত্যাদি' থাকলেও আপত্তি করব না।"

- "হ্যাঁ সুন্দরবাবু, আপনার রসনেন্দ্রিয় কি সর্বদাই 'ইত্যাদি'র জন্যে তৈরি হয়ে থাকে?"

- "সর্বদাই ভাই, সর্বদাই! জীবদেহের প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে উদরপূজা। অতএব আসুক চায়ের সঙ্গে ইত্যাদি। ও মধু, অ শ্রীমধুসূদন! এত মিষ্টি করে ডাকছি, তবু সাড়া পাই না কেন বাপধন?"

সুন্দরবাবু চা এবং 'ইত্যাদি' নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, ততক্ষণে জয়ন্ত কী করছে দেখে আসা যাক।

জয়ন্ত হোটেলের কাছে আসতে-আসতেই দেখতে পেলে, ছাদের উপর থেকে জটাধারী সন্ন্যাসীর মূর্তিটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত ভাবতে লাগল, কেন? তাকেই দেখে নাকি? সে আরও জোরে পা চালিয়ে দিলে।

ভাতের হোটেল। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় ক্ষুধার্ত খরিদ্দারের ভিড়।

মালিক জয়ন্তের পরিচিত। সে উদগ্রীব হয়ে হোটেলবাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, জয়ন্ত কে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁ মশাই, ওখানে অত দুমদাম, চেঁচামেচি, ছুটোছুটি কেন?"

খুব সংক্ষেপে হোটেলওয়ালার কৌতূহল চরিতার্থ করে জয়ন্ত শুধোলে, "আপনার এখানে আজ কোনো স্বামীজি অর্থাৎ সন্ন্যাসীর আগমন হয়েছে?"

- "হয়েছে বইকি! তার নাম বোধহয় ভোজনানন্দ স্বামী!"

- "আপনার এমন অনুমানের কারণ?"

- "একাই উড়িয়ে দিয়েছেন তিনজনের খোরাক। মাছ-মাংস কিছুই বাদ যায় না। নিরামিষে অত্যন্ত অরুচি। জনাকয় এমন স্বামীজিকে পেলে আমাকে আর হোটেল চালাবার জন্যে ভাবতে হয় না।"

- "স্বামীজি কি আপনার পুরনো খরিদ্দার?"

- "উঁহু, আজ এই প্রথম তাঁর পায়ের ধুলো পেলুম।"

- "তিনি এখনও হোটেলে আছেন তো?"

- "আছেন বইকি!"

- "আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।"

- "বেশ তো, সোজা উপরে উঠে যান। বিবিধ উপচারে উদরসেবা করে তিনি এখন দেহকে একটু হালকা করবার জন্যে ছাদের উপরে পায়চারি করছেন।"

কিন্তু ছাদের উপরে স্বামীজির জটা বা টিকির খোঁজ পাওয়া গেল না। হোটেলের কোনো ঘরেও নয়। বাড়ির খিড়কির দরজাটা নাকি ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, কিন্তু এখন খোলা রয়েছে। স্বামীজির অন্তর্ধানের রহস্যটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

জয়ন্ত আবার সদরের দিকে ফিরে এল হতাশভাবে।

হোটেলওয়ালা তখনও সেখানে মোতায়েন ছিল। "স্বামীজির সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হয়নি?" মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে প্রশ্ন করলে।

- "না। কেমন করে জানলেন আপনি?"

- "আপনি উপরে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই স্বামীজিকে খিড়কির দিক থেকে হনহন করে এদিকে আসতে দেখলুম। আমি তাকে আপনার কথা জানালুম। তিনি বললেন, "আমার এখন বড়ো তাড়া, কারুর সঙ্গে মুলাকাত করবার ফুরসত নেই।" তারপর হন্তদন্তের মতো এগিয়ে ওই গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন।"

জয়ন্ত বুঝলে, এখন আর স্বামীজির পশ্চাদ্ধাবন করা মায়ামৃগের পিছনে ছোটার মতোই ব্যর্থ হবে। সে বাড়িমুখো হল এই ভাবতে ভাবতে: স্বামীজি আমার সঙ্গে এমন লুকোচুরি খেলছেন কেন? তিনি বেনামা চিঠি বিলি করে গুম হয়ে যান। নাগাল ধরতে গেলে পিঠটান দেন। যেন আমাদের ভয় করেন! স্বামীজির মাছ-মাংস সবই চলে। একাই খতম করেন তিনজনের খোরাক। যেখানে-সেখানে যার-তার হাতের রান্না খেতেও তার আপত্তি নেই। স্বামীজি সংযম বা বাছবিচারের ধার ধারেন না। তবে কি তিনি নকল স্বামীজি? তার জটাজুট আর গৈরিক সাজ কি বাজে ভড়ং? তিনি কি ছদ্মবেশী?

বাড়িতে পৌঁছতেই মানিক শুধোলে, "কী হল জয়ন্ত? সন্ন্যাসী কী বললেন?"

- "কিছুই বললেন না। অর্থাৎ কিছু বলবার আগেই আড়ালে গা ঢাকা দিলেন!"

- "বটে, বটে? এই সন্ন্যাসীপ্রবর দেখছি রহস্যের অবতার! অতঃপর?"

- "অতঃপর তল্পিতল্পা বাঁধো। আমরা আজকেই মুর্শিদাবাদ যাত্রা করব।"

সুন্দরবাবু সচমকে বললেন, "হুম! এর মানেটা কী?"

- "মানে একটা আছে বই কি! কিঞ্চিৎ তদন্তের দরকার।"

- "কীসের তদন্ত?"

- "গুপ্তধনের।"

বীরেন বললে, "আপনি তাহলে আমার ঠাকুরদার গল্প সত্য বলে মনে করেন?"

- "করি! দেখছেন তো, আপনি এখানে এসেছেন বলে এর মধ্যেই আমাদের

উপরে হামলা শুরু হয়েছে! কোনো লোক বা দল চায় না যে, আমরা আপনাকে সাহায্য করি। তাদের এই আপত্তির মূলে নিশ্চয়ই কোনো গুঢ় কারণ আছে।"

- "কিন্ত সেজন্যে মুর্শিদাবাদে যাবার প্রয়োজন কী?"

- "জগৎশেঠরা মুর্শিদাবাদেই বাস করতেন।"

- "সুতরাং তাদের রত্নকুঠি আছে মুর্শিদাবাদেই, এই হল আপনার যুক্তি?"

- "ঠিক তাই।"

বীরেন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললে, "জগৎশেঠের বিরাট প্রাসাদ মুর্শিদাবাদেই ছিল বটে, কিন্তু এখন গঙ্গা তাকে গ্রাস করেছে। সেখানে আজ গুপ্তধনের সন্ধান করতে গেলে আমাদের ডুবুরি সাজা ছাড়া উপায় নেই। আপনি কি এ খবর রাখেন না?"

- "রাখি বইকি!"

- "তবে? এইজন্যেই তো আমি ঠাকুরদার কাহিনিটা বাজে গল্প বলেই ধরে নিয়েছি।"

- "ভুল করেছেন।"

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন, "তোমার যুক্তিটা শুনি?"

- "যথাসময়ে বলব। এখন তল্পিতল্পা বাঁধবার চেষ্টা করুন।"

- "কিন্তু তাড়াতাড়ি কেন বাপু?"

- "মনে রাখবেন, বীরেনবাবুর ঠাকুরদার লেখা খাতার কিছু অংশ যদুনাথ বসু বা প্রতাপ চৌধুরির হাতে গিয়ে পড়েছে। তার মধ্যেই হয়তো রত্নকুঠির ঠিকানা আছে। দেরি করলে আমাদের ভাগ্যে লাভ হবে অষ্টরম্ভা।"

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

বিপদের সংকেত

মুর্শিদাবাদ। নগরপ্রান্তে শীতকালের মরা গঙ্গা। যেন কোনো অগভীর বড়ো খাল, কারণ জলে স্রোত নেই বললেও চলে। এখানে-ওখানে হেঁটে পার হওয়া যায়।

নৌকার চালে বসে জয়ন্ত বলছিল, "পলাশির যুদ্ধের আগে মুর্শিদাবাদের রূপ ছিল ভিন্নরকম। তখনকার ইংরেজদের চিঠিপত্র পড়ে জানতে পারি, সে মুর্শিদাবাদ আকারে আর সৌন্দর্যে বিলাতের লন্ডন শহরের চেয়ে বৃহৎ আর উন্নত ছিল!"

মানিক বললে, "আজকের মুর্শিদাবাদকে দেখে তো মনে হচ্ছে কলকাতার শহরতলিও এর উপরে টেক্কা মারতে পারে।"

- "এ হচ্ছে আজ স্মৃতির শ্মশান। দিকে দিকে ছড়ানো আছে ভাঙাচোরা ইটের স্তূপ আর পড়ো পড়ো, বেরঙা, শ্রীহীন অট্টালিকা।"

বীরেন বললে, "মরা গঙ্গার ভাঙা ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওই নামমাত্র সার আধুনিক নবাবদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দলে দলে লোক তাই দেখবার জন্যে ওখানে গিয়ে ভিড় করে।"

জয়ন্ত বললে, "আমার কিন্তু ওদিকে ফিরে তাকাতেও লজ্জা করে। যারা একদিন গড়েছিল কবির স্বপ্ন তাজমহল আর আগ্রা-দিল্লির অপরূপ দুর্গপ্রাসাদ, তাঁদেরই রুচিহীন, ভাগ্যতাড়িত বংশধররা আজ গড়ে তুলেছে ইংরেজদের অনুকরণে মস্তবড়ো এক বিজাতীয় প্রাসাদ-নকলের মহিমায় খাস্তা হয়ে গিয়েছে আসলেরও স্বরূপ! এ হচ্ছে দাস-মনোভাবের অসহনীয় পরিচয়!"

বীরেন বললে, "গঙ্গার এপারে মুর্শিদাবাদে জীবন্ত নবাবদের শৌখিন আস্তানা, আর ওপারে আছে তাঁদের মৃতদেহের অন্তিম ধরণীশয্যা। একদিন নবাবির জাঁকে যাঁদের জরির জুতো পরা পা মাটিতে ছুঁতে চাইত না, আজ তাঁদের দেহাবশেষ জীর্ণ কবরের তলায় মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে আছে। আলিবর্দির সমৃদ্ধ সমাধির ছায়ায় দীনতাপূর্ণ কবরের ভিতরে শায়িত আছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব বিপথচালিত সিরাজদ্দৌলার নশ্বর দেহের অশ্রুকরুণ স্মৃতি!"

স্রোতহীন গঙ্গাজলের উপর দিয়ে দাঁড়ি-মাঝিরা দাঁড় টেনে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নৌকো। অগভীর পরিষ্কার গঙ্গাজল, স্পষ্ট দেখা যায় তলা পর্যন্ত-সর্বত্র বিকীর্ণ রয়েছে স্পঞ্জের মতো শৈবালপুঞ্জ।

বীরেন বললে, "ওপারে ওইখানে ছিল সিরাজদৌল্লার প্রমোদপ্রাসাদ! একদিন ওখানে দুলত কক্ষে কক্ষে রঙিন আলোকমালা, নাচ, গান আর বাজনায় সংগীতময় হয়ে উঠত চাঁদের আলো। কিন্তু আজ সেখানে দিনের বেলাতেও শোনা যায় না

মানুষের কণ্ঠরব, কেবল সন্ধ্যান্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে একটানা বেজে চলে ঝিল্লিদের বিজনতার গান আর থেকে থেকে কেঁদে ওঠে শিবাদের অশিব নাদ!"

সুন্দরবাবু শুধোলেন, "আর সেই প্রমোদভবন?"

- "সিরাজদৌল্লার অপঘাত-মৃত্যুর পর তার প্রমোদভবনও গঙ্গাগর্ভে আত্মবিসর্জন দিয়েছে।"

সবাই স্তব্ধ। নৌকো এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে। জলে ঝপঝপ করে দাঁড় ফেলার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

মানিক জিজ্ঞাসা করে, "গঙ্গাতীরের কাছে জলের কাছে জেগে রয়েছে কতকগুলো বড়ো বড়ো ইটের স্তূপ। দেখলে মনে হয়, যেন একসময়ে ওখানে ছিল কোনো অট্টালিকা।"

বীরেন বললে, "তাই বটে। যাঁর কাছে হাত পেতে নবাবের রাজত্ব আর ইংরেজদের ব্যবসায় চলত, একদিন ওইখানেই ছিল ভারতের সেই সবশ্রেষ্ঠ ধনকুবের জগৎশেঠের ঐশ্বর্যগর্বিত বৃহৎ প্রাসাদ! আজও তার দু-এক টুকরো ভগ্নাবশেষ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু অল্প দিনে তাও তলিয়ে যাবে কীর্তিনাশা গঙ্গার গর্ভে।"

জয়ন্ত কঠিন কণ্ঠে বললে, "যাবেই তো। যাওয়াই উচিত। শেঠদের স্মৃতিও আমার মনকে পীড়িত করে। রাজপুতানার শুকনো মরুপ্রান্ত থেকে বিদেশি মাড়োয়ারি এসেছিল সুজলা সুফলা বাংলা দেশের অর্থ লুণ্ঠন করতে। তারা লক্ষ্মীলাভ করেছিল বটে, কিন্তু বাংলার প্রতি ছিল না তাদের এতটুকু প্রাণের টান, তাই তারা বংশানুক্রমে প্রথমে রাজার, তারপর দেশের বিরুদ্ধে বার বার চক্রান্ত করতে কুণ্ঠিত হয়নি। অবশেষে আরও কোনো কোনো দুরাত্মার সঙ্গে মিলে জগৎশেঠরাই ষড়যন্ত্র করে বাংলা দেশকে লুটিয়ে দেয় ফিরিঙ্গিরাজের বুটজুতোর তলায়। সেই মহাপাপের ফলেই তো এই দেশদ্রোহী বংশের উপরে পড়েছে বিশ্বদেবের অমোঘ অভিশাপ, ইতিহাসে আছে কেবল তাদের চরম অপযশ, নিয়তি কেড়ে নিয়েছে তাদের ঐশ্বর্যের শেষ স্মৃতিটুকুও, লাভ করেছে সলিল সমাধি। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করেননি। সুদূর মুঙ্গেরে তাদের দুই ভাইয়ের জীবন্ত দেহ গ্রাস করেও তাঁর ক্ষুধা মেটেনি, মুর্শিদাবাদে এসে বিশ্বাসঘাতকের সম্পত্তি পর্যন্ত নিজের জঠরের জলাবর্তে টেনে না নিয়ে তিনি ছাড়েননি।"

জলের উপরে জেগে থাকা প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের একপাশে চুপ করে ছবিতে আঁকার মতো একটা নিশ্চল বক-যেন বিভোর হয়ে আছে অতীত গৌরবের স্বপ্নে।

বীরেন বললে, “জয়ন্তবাবু, আজ ওই জলের তলায় কোথায় খুঁজে পাবেন জগৎশেঠের রত্নকুঠি?”

জয়ন্ত হেসে বললে, “আমরা তো জলের তলায় খুঁজব না!”

- “তবে কোথায়? ডাঙায়?”

- “হ্যাঁ।”

- “ডাঙায় শেঠদের প্রাসাদের কোনো চিহ্নই নেই!”

- “তবু খুঁজে দেখব।”

- “কী আশ্চর্য, আপনার বক্তব্য কী?”

সুন্দরবাবুও বিরক্ত হয়ে বললেন, “সত্যি জয়ন্ত, তুমি যুক্তিহীন কথা বলছ!”

জয়ন্ত অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "সুন্দরবাবু, খাতায় জগৎশেঠদের ইতিহাসে কী লেখা আছে? জগৎশেঠ কুশলচাঁদ নিজের সম্পত্তির কতক অংশ লুকিয়ে রাখবার জন্যে গুপ্তকুঠি নির্মাণ করেছিলেন। এখন ভেবে দেখুন, কুশলচাঁদ নিশ্চয় নির্বোধ ছিলেন না। নিজেদের জনাকীর্ণ, বিখ্যাত প্রাসাদের ভিতরে গুপ্তকুঠি নির্মাণের চেষ্টা যে ব্যর্থ হবে, এটা তিনি ভালো করেই জানতেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল প্রাসাদ থেকে দূরে অন্য কোথাও গুপ্তকুঠি নির্মাণ করা। রাজধানীর বাইরেও যে ধনকুবের জগৎশেঠদের ভূ-সম্পত্তি ছিল, এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে। বীরেনবাবুর ঠাকুরদা চন্দ্রনাথবাবু গঙ্গাতীরের এক পোড়ো বাগানবাড়ির কথা উল্লেখ করেছেন। তার পিছনে আছে এক সেকেলে নির্জন ইঁদারা-তার গায়ে গাঁথা লোহার দরজা। আমি আন্দাজ করি, ওই বাগানবাড়ির অধিকারী ছিলেন জগৎশেঠ কুশলচাঁদ। সেকালের রাজা-রাজড়া আর ধনপতিরা প্রায়ই পুষ্করিণী বা ইঁদারার মধ্যে গুপ্তধন রক্ষা করতেন, ‘সোনার আনারস’ মামলাতেও আমরা এই শ্রেণির এক ইঁদারার সন্ধান পেয়েছিলুম, আশা করি আপনাদের তা মনে আছে। কুশলচাঁদও নিশ্চয় সেকালের সেই রীতি বজায় রেখেছিলেন। ইঁদারার গুপ্তকুঠির মধ্যে রক্ষা করেছিলেন নিজের অতুল সম্পত্তির কতক অংশ। গুপ্তধন রক্ষা করবার পর সেকালের ধনিকরা আর এক নিষ্ঠুর প্রথা মেনে চলতেন। যাদের সাহায্যে তাঁরা ধনরত্ন পুঁতে রাখতেন,

গুপ্তধনের নিরাপত্তার জন্যে তাদের হত্যা করা হত। কুশলচাঁদও তাই করেছিলেন, আর চন্দ্রনাথবাবু ইঁদারায় নেমে দেখেছিলেন সেই নিহত হতভাগ্যদেরই মাংসহীন কঙ্কাল। ইঁদারা নির্মাতা আর ধনবাহকদের হত্যা করবার পর কুশলচাঁদ ইঁদারা জলে ভরিয়ে দিয়েছিলেন, তারপরে কালক্রমে কুশলচাঁদের মৃত্যু, জগৎশেঠদের পতন, তাঁদের প্রাসাদের পাতালপ্রবেশ, বেওয়ারিশ বাগানবাড়ির শোচনীয় দুর্দশা-ঘরদোর যায় ভেঙেচুরে, বাগান পরিণত হয় কাঁটাজঙ্গলে আর ইঁদারা হয়ে যায় জলশূন্য। মানুষ আর সে অঞ্চল মাড়ায় না। অনেককাল পরে চন্দ্রনাথবাবু ফুটবল কুড়োতে ইঁদারায় নেমে অস্থানে লোহার দরজা দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তিনি জগৎশেঠদের গুপ্তধনের কাহিনি জানতেন। তাঁর সন্দেহ জাগ্রত হয়। তারপর আবার গোপনে ইঁদারায় ফিরে গিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান পান আর তা হস্তগত করেন। বোধহয় সেই সম্পত্তিরই খানিক অংশ নিয়ে তার ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন। অবশিষ্ট সম্পত্তি অসময়ের ভয়ে আবার লুকিয়ে রাখেন। আমরা তারই আশায় এখানে এসেছি। তাঁর লেখা খাতার সবটা পেলে হয়তো আমাদের কাজের যথেষ্ট সুরাহা হত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা বিপক্ষ দলের হস্তগত হয়েছে। তবু আমরা একবার বাগানখানা খুঁজে দেখবার চেষ্টা করব।”

সুন্দরবাবু কৌতুকহাস্য করে বললে, “ভায়া হে, তুমি যে দেখছি বেশ একটি মনগড়া গল্প ফেঁদে বসে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই অজানা বাগানবাড়ির ঠিকানা কোথায় পাবে?”

- “চন্দ্রনাথবাবু লিখেছেন, জিয়াগঞ্জের দশ-বারো মাইল তফাতে আছে সেই বাগানবাড়ি।”

- “হুম, তাহলেই কেল্লা ফতে হয়ে গেল নাকি?”

- “আরে মশাই, একটু মাথা খাটাবার চেষ্টা করুন। ভুলবেন না, জায়গাটা আছে গঙ্গার ধারে। মুর্শিদাবাদের পরেই জিয়াগঞ্জ। সেখান থেকে আমরা হাঁটাপথে গঙ্গাতীর ধরে দশ-বারো মাইল অগ্রসর হব। তারপর খুঁজে সহজেই আবিষ্কার করতে পারব এমন একখানা বেওয়ারিশ, ভাঙাচোরা, পোড়ো, সেকেলে বাগানবাড়ি-যার পিছনে আছে জলশূন্য ইঁদারা আর তার পরে একটা মাঠ। গঙ্গাতীরে দশ-বারো মাইলের ভিতরে ঠিক এইরকম পরিস্থিতির মাঝখানে পরিত্যক্ত প্রাচীন বাগানবাড়ি বোধকরি আর নেই।”

মানিক বললে, "আমি তোমার মত সমর্থন করি।"

সুন্দরবাবু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, "জয়ন্ত যেভাবে কায়দা করে ব্যাপারটাকে সাজিয়ে দাঁড় করিয়েছে, তাতে আমাদেরও সায় দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কী বলেন বীরেনবাবু?"

বীরেন বললে, "আমি আর কী বলব মশাই, এসব গোলমেলে ব্যাপারে আমার মাথা খোলে না। তবে আমার মন্ত্র হচ্ছে-'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'।"

সুন্দরবাবু বললেন, "সাধু, সাধু। একালের ছোকরারা সবাই যদি ওই মন্ত্র মানত! তাহলে জয়ন্ত, কোথায় নেমে আমরা হাঁটাপথ ধরব?"

- "জিয়াগঞ্জের ঘাটে।"

মানিক খুঁতখুঁতে গলায় বললে, "কিন্তু জয়ন্ত, অনেকক্ষণ থেকে আমি একটা ব্যাপার লক্ষ করছি।"

- "কী ব্যাপার?"

- "একটানা একটা উটকো পানসি আমাদের পিছনে পিছনে আসছে।"

- "হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। তার অন্য সব জানালা বন্ধ, কেবল একটা খোলা জানালায় একজন লোক যেন আমাদেরই পানে তাকিয়ে আছে।"

- "পানসিখানা একবারও আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়নি। আমরা যখন জগৎশেঠের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের কাছে নৌকো থামিয়েছিলুম, ও পানসিখানাও থেমে পড়েছিল। তারপর. আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই আবার ওর যাত্রা শুরু!"

মাঝি হাঁকলে, "বাবুজি, এই তো জিয়াগঞ্জের ঘাট!"

জয়ন্ত বললে, "এসো আমরা এইখানে নেমে পড়ে ওই পানসিখানার ওপরে নজর রাখি।"

নৌকো ঘাটে লাগল। সবাই একে একে নেমে পড়ে একখানা বাড়ির আড়ালে গিয়ে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইল।

অজানা পানসিখানা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল! আধ মিনিট থেমে দাঁড়াল, তারপর আবার ঘাট ছাড়িয়ে তরতর করে সোজা চলে গেল যেদিকে যাচ্ছিল সেইদিকে।

সুন্দরবাবু বললেন, “বাববা, বাঁচলুম, ফাড়া কেটে গেল। ভেবেছিলুম, ষণ্ডামার্কা ব্যাটারা আবার বোমা কি বন্দুক ছুড়বে, মনে মনে আমি জলযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলুম।”

তাঁর গা টিপে দিয়ে মানিক বললে, “এখনই অপ্রস্তুত হবেন না মশাই!”

- “হুম, মিছে ভয় দেখাও কেন?”

- “আবার ওই দেখুন।”

- “কী আবার দেখব?”

- “আবার একখানা নৌকো আসছে।”

- “এলেই বা! নদী দিয়ে নৌকো যাবে না?”

- “নৌকোর জানালার কাছে কে বসে আছে দেখছেন তো?”

সুন্দরবাবু দেখলেন, চমকে উঠলেন, তাঁর দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত!

নৌকোর জানালার কাছে যে বসে আছে, তার মাথার জটার ঘটা, মুখে গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল, গায়ের গেরুয়া কাপড়েরও খানিকটা দেখা যাচ্ছে!

জয়ন্ত বললে, “সেই সন্ন্যাসী।”

এ নৌকোখানাও জিয়াগঞ্জের ঘাট ছাড়িয়ে অগ্রসর হল।

সুন্দরবাবু বললেন, “কী যেন হচ্ছে, কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।”

জয়ন্ত বললে, “এখন আর কিছুই বোঝবার দরকার নেই-এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন।”

।। অষ্টম অধ্যায় ।।

ষড়যন্ত্রের গন্ধ

গঙ্গার ধারে সে জায়গাটাকে বাগানও বলা যায় না, বাড়ি বলাও চলে না। তার স্থানে স্থানে সীমানার বেষ্টনীর কিছু কিছু চিহ্ন এখনও চোখে পড়ে, এই মাত্র। বাগানের বদলে আছে গোটা কয়েক পুরাতন অফলা ফলগাছের সঙ্গে অশ্বত্থ-বটের দঙ্গল ও যত্রতত্র বিকীর্ণ ঝোপঝাপ আগাছার জঙ্গল। এবং বাড়ির বদলে আছে ভেঙে পড়া ছাদ আর ধসে যাওয়া বনিয়াদ আর কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে থাকা এক-একটা টুটা-ফাটা

দেওয়াল। দরজা-জানালা একেবারেই অদৃশ্য। তবে একসময়ে এখানে যে কোনো শৌখিন ধনিকের সাধের ডেরা ছিল, তার সামান্য প্রমাণ এখনও বর্তমান আছে এক-একটা ভাঙা দেওয়ালের গায়ে বিমলিন পঙ্খের কারুকার্যে। লোকের মুখে শোনা যায়, আগে এখানে ছিল বাগানবাড়ি এবং তার পিছনকার মস্তবড়ো মাঠটা আজও বাগানবাড়ির মাঠ নামে পরিচিত। সেই সূত্রেই জায়গাটার খোঁজ পাওয়া সহজে সম্ভবপর হয়েছে।

জয়ন্ত বললে, "এই হচ্ছে সেই ইঁদারাটা। বাঙালিরা যে কুয়া বা পাতকুয়া তৈরি করে তা হচ্ছে ইঁদারারই ছোটো আকার। সাধারণত ইঁদারা তৈরি করে অবাঙালিরা আর মনে রাখতে হবে জগৎশেঠদের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন রাজপুতানা থেকে।"

সুন্দরবাবু ইঁদারার ভিতরে উঁকিঝুঁকি মেরে বললেন, "ওরে বাবা, এর তলাটা যে অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না! তলায় কী আছে কে জানে!"

জয়ন্ত বললে, "সঙ্গে দড়ির সিঁড়ি এনেছি, তলায় কী আছে এখনই দেখতে পাব।"

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, "না ভেবেচিন্তে যখন ডানপিটেদের সঙ্গে এসেছি, তখন পাতাল কত দূর না দেখেই বা উপায় কী? কিন্তু বাপু, আমার অসামান্য বপুখানি নিয়ে ওই যৎসামান্য দড়ির সিঁড়ি ধরে দোদুল্যমান হলে আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, সেটা খেয়ালে আছে কি?"

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে দড়ির সিঁড়ি নিয়ে নিযুক্ত হয়ে রইল। সুন্দরবাবু সেদিক থেকে কোনো সান্ত্বনা না পেয়ে বললেন, "তার উপরে জানোই তো, আমার আবার একটুখানি-ওর নাম কী-ইয়ে আছে!"

মানিক সুন্দরবাবুকে জানত, মুখ টিপে হাসতে লাগল।

বীরেন কিছুই বুঝতে না পেরে শুধোলে, "ইয়ে আছে? সে আবার কী?"

- "ওই যে গো, যাকে তোমরা বলো ভূতপ্রেত!"

- "ভূতপ্রেত?"

- "হ্যাঁ। আমি যে ওঁদের অস্তিত্ব মানি!" বলেই সুন্দরবাবু যুক্তকরে ললাটদেশ স্পর্শ করলেন।

- "ভূতপ্রেতের সঙ্গে আজকের ব্যাপারের সম্পর্ক কী?"

- "সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছেন না? পাজি কুশলচাঁদটা নাকি অনেকগুলো লোককে খুন করেছিল আর তাদের কঙ্কালগুলো নাকি ইঁদারার ভেতরেই পড়ে আছে। হুম! তাদের প্রেতাত্মারাও যে ওইখানে আস্তানা পাতেনি, এমন কথা কি জোর করে বলা যায়? অভিশপ্ত শেঠদের গুপ্তধনও আজ হয়েছে যকের ধন, প্রাণটি হাতে করে ওই ইঁদারার ভেতরে নামতে হবে?"

মানিক বললে, "বেশ তো, প্রাণটি হাতে করেই ইঁদারায় নামবেন, ভূতপ্রেতরা দাবি করলেও তাদের হাতে প্রাণ সমর্পণ করবেন না।"

সুন্দরবাবু মুখ গোমড়া করে বললেন, "মরছি নিজের জ্বালায় তুমি আবার মশকরা করে জ্বালার উপরে জ্বালা দিয়ো না মানিক! আমি সার কথাই বলছি। চন্দ্রনাথবাবু কি ইঁদারায় নেমে অপার্থিব কণ্ঠের ফোঁসফোঁসানি শোনেননি?"

জয়ন্ত বললে, "তার মধ্যে অপার্থিব কোনো কিছু নেই।"

- "নেই? তবে ফোঁসফোঁসানিটা কীসের শুনি?"

- "নিশ্চয় সাপ-টাপ। এঁদো কুয়োয় সাপ বাসা বাঁধে।"

- "এটা তোমার অনুমান মাত্র।"

জয়ন্ত দড়ির সিঁড়ির উপরে পা রেখে অধীর স্বরে বললে, "বাজে কথায় সময় বয়ে যায়! বেলা বেড়ে চলেছে, আর দেরি নয়! মানিক, পাতালে আছে রাতের অন্ধকার, একটা লণ্ঠন আমাকে দাও, আর একটা লণ্ঠন তোমার পিঠে ঝুলিয়ে নাও।"

সুন্দরবাবু অস্বস্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত, বিপদসাগরে গোঁয়ারের মতো চোখ বুজে ঝাঁপ দিয়ো না! আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, কারা যেন আড়ালে-আবডালে গা ঢাকা দিয়ে আছে!"

- "শত্রুরা কেমন করে জানবে, আমরা বাগানবাড়ির ঠিকানা আবিষ্কার করেছি?"

- "কিন্তু বুদ্ধিমানের মতে, শত্রুদের অবহেলা করা উচিত নয়।"

জয়ন্ত ইঁদারার মুখ থেকে সরে এসে বললে, "মানিক, সুন্দরবাবু ঠিক কথাই বলেছেন, ওঁর পাকা চুলের সম্মান রক্ষা না করলে অন্যায় হবে। আবিষ্কারের উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে আমরা আসল কথাই ভুলে গিয়েছিলুম।"

মানিক বললে, "না ভুলিনি, এ ব্যাপারে আসল কথাই হচ্ছে গুপ্তধনের কথা।"

- "ঠিক তাই কি? আমার মতে, এখনও "দিল্লি বহুদূর"! যাত্রাপথে বিস্তর বাধা! গুপ্তধন আমাদের চরম লক্ষ্য বটে, কিন্তু যাতে লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছতে না পারি, সেই উদ্দেশ্যে একদল শত্রু কি আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করছে না?"

- "কিন্তু সেই শত্রুরা এখন কোথায়?"

- "জলপথে তারা যে আমাদের অনুসরণ করেছিল সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।"

- "কিন্ত হঠাৎ স্থলপথ অবলম্বন করে আমরা তাদের ফাঁকি দিতে পেরেছি।"

- "পেরেছি কি? এইটেই হচ্ছে প্রশ্ন।"

- "হাঁটা পথে এতখানি এগিয়ে এলুম, কোনো শত্রুর ছায়া পর্যন্ত দেখতে পাইনি।"

- "তা পাইনি। কিন্তু 'সোনার আনারস' মামলায় আমরা যখন বাঘারাজাদের গুপ্তধনের সন্ধানে যাত্রা করেছিলুম, তখন সারা পথের কোথাও কি প্রতাপ চৌধুরির অস্তিত্ব টের পাওয়া গিয়েছিল? আগেই তোমাদের কাছে আমি প্রতাপ চৌধুরির পরিচিত যুদ্ধকৌশলের কথা উল্লেখ করেছি। এ যদি সেই প্রতাপ চৌধুরি হয়, তবে এবারেও সে নিজের নির্বাচিত স্থান ছাড়া যেখানে-সেখানে আত্মপ্রকাশ করবে কেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমি কিন্তু পথ চলতে চলতে হাওয়ায় হাওয়ায় পেয়েছিলুম কেমন যেন ষড়যন্ত্রের গন্ধ!"

মানিক হেসে বললে, "পুলিশের চাকরি ছাড়বার পর দেখছি সুন্দরবাবুর ঘ্রাণশক্তি প্রখরতর হয়ে উঠেছে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম ঠাট্টা করতে চাও, ঠাট্টা করো! কিন্তু সংস্কৃত বচনে কি আছে জানো তো? 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে'। অর্থাৎ বিপদের সময়ে বুড়োদের কথা গ্রাহ্য করা উচিত।"

মানিক বিস্ময়ের ভান করে বললে, "ও হরি, কালে কালে হল কী? হ্যাঁ জয়ন্ত, তুমি কি আর কখনও সুন্দরবাবুকে সংস্কৃত বুলি ঝাড়তে শুনেছ?"

- "তা শুনিনি বটে, তবে আপাতত ওঁর পরামর্শে আমাদের কান পাতা উচিত।"

- "তুমি কী বলতে চাও?"

- "শত্রুরা সজাগ।"

- "সজাগ, কিন্তু তারা অবস্থান করছে কোথায়?"

- "ধরে নাও আশেপাশে । সামনে নয়, অন্তরালে। তারা আছে যে কোনো সুযোগের অপেক্ষায়।"

- "আমরাও কি ঘুমিয়ে আছি?"

- "তা নেই, কিন্ত এখনও আমরা অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি। আমাদের সামনেই এমন সব কাণ্ড হচ্ছে, যার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।"

- "যথা?"

- "ধরো আজকের ঘটনাই। গঙ্গায় আমাদের পিছু নিয়েছিল যেন শত্রুদেরই পানসি। কিন্তু তার পিছনে পিছনে নৌকোয় চেপে যে সন্ন্যাসী আসছিল, সে কে? সে কাদের অনুসরণ করছিল-আমাদের না শত্রুদের? কেন অনুসরণ করছিল, তার স্বার্থ কী? সেই-ই কি বেনামা পত্রলেখক? কেন সে আমাদের সাবধান করে দিতে চায়, সে কি আমাদের বন্ধু? এমন অচিন বন্ধু কি বিস্ময়কর নয়?"

মানিক ফাঁপরে পড়ে বললে, "প্রশ্নে প্রশ্নে তুমি যে আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে দিলে হে!"

- "না ভাই না! এ সব প্রশ্ন আমি কেবল তোমাকেই করছি না, নিজেকেও করছি নিজে নিজেই। কিন্তু এ সব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। তোমার কাছে আছে?"

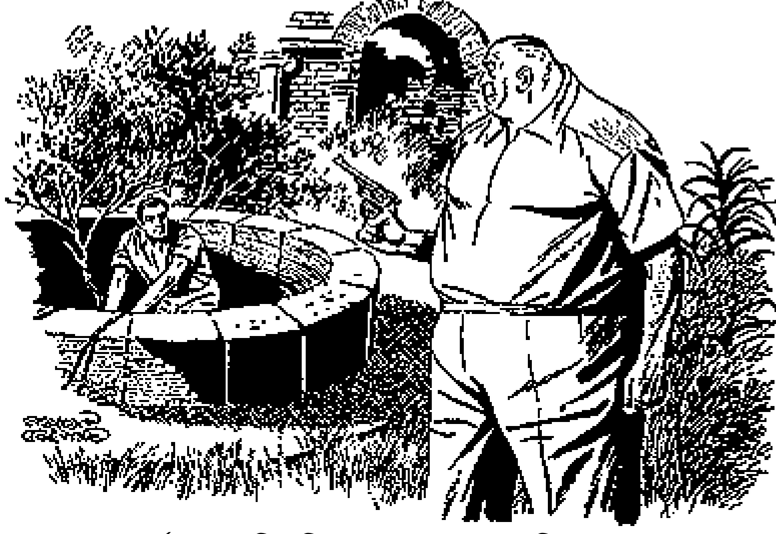
- "উঁহু!"

- "অতএব সুন্দরবাবু হাওয়ায় হাওয়ায় যে ষড়যন্ত্রের কথা তুলেছেন, সেটা তাৎপর্যমূলক বলে মানতে হবে বই কি!"

- "উত্তম, সুন্দরবাবুর নাকে শোঁকা ষড়যন্ত্রের গন্ধকে স্বীকার করিনি বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। জয়ন্তও যদি সুন্দরবাবুর পক্ষ সমর্থন করে তাহলে একসঙ্গে দুইজনের প্রতিযোগিতা করবার সাধ্য আমার নেই।"

সুন্দরবাবু অভিমানের স্বরে বললেন, "মানিক, এখনও তুমি ঠাট্টার সুরে কথা কইছ! কিন্তু ভাই, আমি কি ন্যায্য কথাই বলিনি?"

মানিক এইবার গম্ভীর হয়ে বললে, "না, সুন্দরবাবু, সব শুনে আমি এখন আপনার কথাতেই সায় দিচ্ছি। কিন্তু অতঃপর আমাদের কর্তব্য কী?"



জয়ন্ত বললে, "কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি। আমাদের সকলের একসঙ্গে ইঁদারায় নামা চলবে না।"

- "তবে?"

- "অন্তত একজনকে এখানে পাহারায় মোতায়েন থাকতে হবে।"

- "থাকবে কে?"

- "সুন্দরবাবু।"

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললে, "হুম! আমি? একলা?"

- "দোকলা পাবেন কাকে? মানিক কিছুতেই আমাকে ছাড়তে রাজি হবে না। আর আমিও তাকে ছাড়ব না, সে আমার ডান হাতের মতো। আর বীরেনবাবু এ সব ব্যাপারে একেবারে কাঁচা, ওর এখানে থাকা-না-থাকা সমান কথা।"

সুন্দরবাবু বললেন, "না, না, বীরেনবাবুকে আমিও চাই না। যদি কোনো বিপদ ঘটে, ওঁকে সামলানোই দায় হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার পক্ষেও এখানে একলা থাকাটা কি সমীচীন হবে?"

- "কেন হবে না? আপনি বহুযুদ্ধজয়ী সৈনিক। আপনার একহাতে রইল রিভলভার, আর এক হাতে সংকেত-বাঁশি। বিপদ দেখলে দুটোই ব্যবহার করবেন। আমরাও তো হাতের কাছেই রইলুম-বাঁশি শুনেছি কি ছুটে এসেছি! এসো মানিক, আসুন বীরেনবাবু!"

জয়ন্ত সর্বাগ্রে ইঁদারার ভিতরে গিয়ে নামল।

সুন্দরবাবু রিভলভার বার করে মৃদুকণ্ঠে বললেন, "জয় বিপদভঞ্জন মধুসূদন!"

।। নবম অধ্যায় ।।

রসাতলের কারাগার

পশ্চিমের সম্ভ্রান্ত বাড়ির ইঁদারার মতো ব্যবস্থা। বেড় রীতিমতো বড়ো, সার সার সিঁড়ির ধাপ নেমে গিয়েছে নীচের দিকে কিছুদূর পর্যন্ত। তারপরেই অবারিত শূন্যতা। এবং অল্পে অল্পে ঘনায়মান অন্ধকার।

মাঝে মাঝে টর্চের চাবি টিপলে দেখা যায় মানুষের অভাবিত ও বিরক্তিকর আবির্ভাবে ইঁদারার গায়ে দিকে দিকে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে মাকড়সা, বিছে ও কাঁকড়াবিছে দলে দলে। আরও কত জাতের অজানা জীবের চোখে ফোটে বিদ্যুতের ঝলক। মন চমকে দেয় তক্ষকদের প্রতিবাদ। সর্বাঙ্গ ভয়ার্ত হয়ে ওঠে ভীষণ ফোঁস ফোঁস শব্দে।

জয়ন্ত বললে, "শুনছ মানিক?"

- "শুনছি।"

- "চন্দ্রনাথবাবুর অপার্থিব গান!"

বীরেন ভয়ে কুঁচকে বললে, "ও মশাই, কামড়াবে না তো?"

- "সেটা ওদের খুশি! আর আমাদের বরাত।"

মানিক বললে, "নামছি তো নামছিই। বাবা, ইঁদারাটা কত গভীর?"

- "অন্ধকার যেন নিরেট হয়ে উঠেছে। আর বেশি নামতে হবে না।"

তারপর আলো ফেলে দেখা গেল, রাশি রাশি অস্থি ছড়িয়ে পড়ে ইঁদারার তলদেশটা ভয়াবহ শুভ্রতায় ভরিয়ে তুলেছে।

জ্বলল দুটো লণ্ঠনের আলো। গুনে দেখা গেল নয়টা অস্থিসার নরমুণ্ড, সেগুলো কঙ্কাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সেই সব ওষ্ঠাধারের আবরণমুক্ত বিকট দন্তবিকাশ দেখলেই বুকটা ধড়াস করে ওঠে আর প্রাণ মূর্ছিত হয়ে পড়তে চায় সেই সব দৃষ্টিহীন চক্ষুকোটরের বীভৎসতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

জয়ন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, "লোভী ধনীর মারাত্মক খেয়ালের খোরাক হবার জন্যে নয়-নয় জন হতভাগ্যের জীবনলীলা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখানে ফুরিয়ে গিয়েছে-তাদের অন্তিম আর্তনাদের সঙ্গে মেশানো ছিল জীবনের যত অতৃপ্ত বাসনা।

সুন্দরবাবুর মত মানলে আমিও বলতুম, তাদের অশান্ত আত্মারা আজও ওই অস্থিস্তূপগুলোর মায়া ছাড়তে পারেনি, আজও তারা এই সংকীর্ণ অন্ধকার কারাগারে বন্দি হয়ে পুনর্বার দেহধারণের জন্যে তপস্যা করছে।"

হঠাৎ বীরেন সভয়ে চিৎকার করে উঠল।



- "কী হল বীরেনবাবু?"

বীরেন কাঁপতে কাঁপতে একটা নরমুণ্ডের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

- "ওখানে কী?"

- "ওর কোটরের মধ্যে চোখ জ্বলজ্বল করছে!"

জয়ন্ত বিস্মিত হয়ে দেখলে, সত্যই তাই-জ্বলন্ত চক্ষুকোটর! জ্বলছে, একটু একটু নড়ছে! কিন্তু সে ভয় পেলে না, হাতের টর্চের সাহায্যে নরমুণ্ডটাকে ঠেলে দিলে-কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এল একটা ত্রস্ত টিকটিকি!

শুকনো হাসি হেসে মানিক বললে, "সত্যি ভাই জয়ন্ত, আমারও বুকটা ছ্যাৎ করে উঠেছিল! এমনি করেই লোকে ভূত দেখে!"

এখন তারা সত্য-সত্যই এসে দাঁড়িয়েছে নিরবচ্ছিন্ন তমসাবৃত পাতালপ্রদেশে। তাদের চারিপাশ ঘিরে থমথম করছে নিঃসাড় মৃত্যুর মতো বুকচাপা এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা এবং মানুষের কল্পনাতীত সেই নিদ্রায়মান ও প্রগাঢ় স্তব্ধতার মধ্যে তাদের অনুচ্চ কণ্ঠস্বরগুলোও শোনাচ্ছিল কর্ণপটহভেদী দামামানির্ঘোষের মতো।

জয়ন্ত ও মানিক লণ্ঠন দুটো মাথার উপরে উঁচু করে তুলে ধরলে ভালো করে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করার জন্যে।

প্রথমেই চোখে পড়ল গর্ভগৃহের লৌহকপাট; এত ছোটো যে দ্বারপথ দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গেলে মাথা নামিয়ে হেঁট না হলে চলবে না।

জয়ন্ত সচকিতকণ্ঠে বললে, "এ কী! দরজার পাল্লা দু-খানা যে খোলা!"

মানিক বললে, "এ বোধহয় চন্দ্রনাথবাবুর কীর্তি! গুপ্তধন পাওয়ার আনন্দে আকুল হয়ে তিনি যাবার সময় দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন।"

জয়ন্ত আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হল না। তবু মুখে বললে, "তাই হবে। তবে আজ যখন ইঁদারার জল শুকিয়ে গিয়েছে, দরজা খোলা থাকলেও কোনো ক্ষতি হবে না।"

তারপর সে খুব মন দিয়ে দরজার কাছটা দেখতে দেখতে বললে, "দ্যাখো মানিক, ইঁদারার এখানটা পাথর দিয়ে শক্ত করে গড়া। আর ওস্তাদ কারিগররা পাথরের গায়ে এমন নিপুণ হাতে লোহার কপাট বসিয়েছে যে একফোঁটা জলও ভিতরে ঢুকতে পারবে না।"

মানিক বললে, "দরজা গড়তে নিশ্চয় খুব ভালো ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছে। কত কাল জলের তলায় ডুবে ছিল, তবু মরচে ধরেনি।"

উদগ্র আগ্রহে ও দুঃসহ কৌতূহলে বীরেনের তখন আর তর সইছিল না। সে এগিয়ে গিয়ে বললে, "আসুন, আমরা ভিতরে প্রবেশ করি!"

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, "আরে মশাই, দাঁড়ান! লণ্ঠনের সঙ্গে সকলে টর্চ ব্যবহার করুন। কে জানে ভিতরে কী বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে!"

তাড়াতাড়ি পিছোতে পিছোতে বীরেন বলল, "বিপদ? কী বিপদ?"

- "এই পাতালপুরীতে বহুকাল পরে দরজা খোলা পেয়ে এর ভেতরে শখের বাসা বাঁধতে পারে কেউটে, কি গোখরো, কি ময়াল সাপ! কেউ বিষ ছড়ায়, কেউ পিষে মারে!"

আরও পিছিয়ে গেল বীরেন। শোনা গেল, তার অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হল বিপৎকালে প্রথমেই যা মনে আসে সেই 'বাবা' শব্দটি।

তিন-তিনটে সঞ্চরমান আলোকশিখায় সমুজ্জল হয়ে উঠতে লাগল একখানা মাঝারি আকারের পাথুরে ঘরের এদিক এবং ওদিক। কিন্তু ভয়াল ময়াল বা কোনোজাতীয় বিষধর সরীসৃপ আত্মপ্রকাশ করলে না।

নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরের ভিতরে পদার্পণ করে জয়ন্ত বিস্মিত স্বরে বললে, "কিন্তু কোথায় আছে গুপ্তধন? এ যে একেবারে খালি ঘর!"

বীরেন বললে, "এখানে এসেও মাটি কোপাতে হবে নাকি?"

চতুর্দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টি সঞ্চালন করে যা দেখবার সব দেখে নিয়ে জয়ন্ত বললে, "মাটি? কোথায় মাটি? এখানে সব পাথর! আমাদেরও পাথুরে কপাল!"

মানিক বললে, "আমরা নির্বোধ! গাছে কাঁঠাল আছে ভেবেই গোঁফে তেল মাখিয়েছি, কিন্তু তার আগেই কাঁঠাল হয়েছে বুদ্ধিমানের হস্তগত।"

বীরেন হতাশভাবে বললে, "এ তাহলে প্রতাপ চৌধুরির কাজ!"

জয়ন্ত বললে, "তাহলে মানতে হবে যে প্রতাপ চৌধুরি হচ্ছে অত্যন্ত ত্বরিতকর্মা।"

মানিক বললে, "জয়ন্ত, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে চন্দ্রনাথবাবুর লেখা সম্পূর্ণ খাতা আমরা পড়বার সুযোগ পাইনি, তার খানিকটা অংশ হস্তগত হয়েছে প্রতাপ চৌধুরির

আর সেই অংশটাই হচ্ছে হয়তো আসল অংশ। সেটুকু ছিঁড়ে নিয়ে প্রতাপ বাকি কাগজগুলো তুচ্ছ ভেবে ফেলে দিয়ে গেছে!"

জয়ন্ত চিন্তান্বিত মুখে বললে, "কিন্ত-কিন্তু এক জায়গায় তবু খটকা থেকে যাচ্ছে!"

- "কোন জায়গায়?"

জয়ন্ত জবাব দেবার আগেই আচম্বিতে ঝনঝন শব্দে পাতালপুরীর সেই কক্ষটা ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

সকলে সবিস্ময়ে সচকিত চক্ষে দেখলে, ঝন-ঝন-ঝানাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল লৌহকপাট!

জয়ন্ত বেগে ছুটে গিয়ে দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে টানাটানি করতে লাগল, কিন্তু কপাট খুলল না, একটু নড়লও না। সে ফিরে দাড়িয়ে তিক্ত হাসি হেসে বললে, "মানিক, মানিক, রসাতলের কারাগারে আমরা বন্দি হলুম!"

॥ দশম অধ্যায় ॥

অঘটন সংঘটন রহস্য

খানিকক্ষণ কারুর মুখ দিয়েই হল না বাক্য-নিঃসরণ।

সেই ভূগর্ভগৃহের স্তব্ধতা এমন নিবিড় যে, হাতঘড়ির ক্ষীণ টিকটিক শব্দকেও মনে হয় উচ্চরোল!

জয়ন্ত শুধোলে, "ঘড়িতে ক-টা বেজেছে?"

মানিক দেখে বললে, "সাড়ে পাঁচটা।"

- "হুঁ। বাইরের পৃথিবী এখন সন্ধ্যার ছায়াছবির জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তারপর ফুটবে কালো রাত। তারপর আবার আসবে রঙিন প্রভাত। তারপর আবার হবে জ্যোতির্ময় সূর্যোদয়। কিন্তু আমরা আবার তা দেখতে পাব না। কী বলো মানিক?"

- "লণ্ঠন দুটোর তেল কাল সকালেই বোধহয় ফুরিয়ে যাবে। টর্চের আলো দেবার শক্তিও বেশিক্ষণ নয়। তারপর আমরা দেখব খালি অন্ধ-করা অন্ধকার। যতক্ষণ বাঁচব ততক্ষণ।"

- "কিন্তু সে কতক্ষণ মানিক? আমাদের সঙ্গে না আছে জল, না আছে খাবার।"

বীরেন একেবারে বোবা।

জয়ন্ত ঘরের ভিতরে এক চক্কর ঘুরে এসে বললে, "কিন্ত দরজা বন্ধ করতে পারে কে?"

মানিক বললে, "এক পারেন সুন্দরবাবু। কিন্ত এমন সাংঘাতিক কৌতুক তিনি করবেন বলে বিশ্বাস হয় না।"

- "আর পারে প্রতাপ চৌধুরি।"

- "কিন্তু ইঁদারার মুখে পাহারায় আছেন সুন্দরবাবু।"

- "হয়তো তিনিও বন্দি। কিংবা নিহত। প্রতাপ চৌধুরির নরহত্যায় আপত্তি নেই।"

- "আমরা কিন্ত উপর থেকে রিভলভারের বা সংকেত-বাঁশির আওয়াজ শুনতে পাইনি। হয়তো উপর থেকে কোনো আওয়াজই এত নীচে পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না।"

- "কিংবা সুন্দরবাবু রিভলভার কি বাঁশি ব্যবহার করবার সময় পাননি।"

- "অমনি একটা কিছু হয়েছেই। কিন্তু ফল একই। আমাদের মরতে হবে।"

বীরেন কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, "এইভাবে মরব বলেই কি জন্মেছিলুম? অন্ধকারে, অনাহারে, দিনে দিনে, তিলে তিলে?"

জয়ন্ত বললে, "প্রতাপ চৌধুরি আরও দু-বার আমাদের যমালয়ে পাঠাবার জন্যে বন্দি করেছিল। দু-বারই আমাদের রক্ষা করেছিল অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিয়তি।"

- "কিন্তু, এবারে তার পুনরাভিনয়ের কোনো সম্ভাবনাই দেখছি না।"

- "মানিক, চিরদিনই আমি নিয়তিবাদী। আজও নিয়তির উপরে নির্ভর করা ছাড়া আমাদের আর কোনোই উপায় নেই।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মানিক বললে, "তাই বটে।"

আবার কিছুক্ষণব্যাপী নীরবতা । আবার কানে জাগে হাতঘড়ির টিক-টিক-টিক-টিক।

জয়ন্ত বললে, "একটু আগেই যা বলেছিলুম। প্রতাপ চৌধুরির যুদ্ধকৌশলের কথা। তার পদ্ধতি কিছুমাত্র বদলায়নি। সে নিজে দেখা দেয় না। কিন্তু শত্রুদের বন্দি

করে। সেরা শিল্পীদের পদ্ধতি বদলায় না। অপরাধের আর্টে প্রতাপ চৌধুরিকে সেরা শিল্পী বলে মানতেই হবে।”

বীরেন ভাঙা ভাঙা স্বরে বললে, “জয়ন্তবাবু, এই কি অপরাধের আর্ট নিয়ে আলোচনা করবার সময়?”

জয়ন্ত শান্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললে, “তাছাড়া আর কি করবেন ভাই?”

- “আর কিছুই করবার নেই?”

- “কিছু না, কিছু না!”

- “ভালো করে দেখেছেন?”

- “কী?”

- “দরজাটা সত্যই বন্ধ কি না?”

- “আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে?”

- “কী জানি, যদি-”

- “বেশ, আপনিও একবার টেনে দেখুন না!”

- “তা একবার দেখলে ক্ষতি কী?”

- “কোনো ক্ষতি নেই। কিছু না করার চেয়ে একটা কিছু করা ভালো। যান আপনিও দরজা ধরে টানাটানি করে আসুন। খানিকটা সময় তবু কাটবে।”

বীরেন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল জীবনহীন যন্ত্রচালিত পুত্তলের মতো-তার মুখে নেই কোনোরকম উৎসাহের ভাব। জয়ন্ত ও মানিক তার দিকে ফিরেও তাকালে না।

বীরেন আংটা ধরে খুব জোরে এক টান মারলে এবং সঙ্গে সঙ্গে হড় হড় ঝনঝন করে বন্ধ দরজার পাল্লা আবার খুলে গেল!

শব্দ শুনে চমকে জয়ন্ত ও মানিক মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে। নিজেদের চোখকেও তারা বিশ্বাস করতে পারলে না, ভাবলে তারা জেগে-জেগেই দেখছে কোনো অসম্ভব স্বপ্ন!

না এ ভোজবাজি-বীরেন জাদুর খেলা জানে?

বীরেনও হতভম্ব-তার মুখ দিয়ে হল না বাক্যস্ফূর্তি!

জয়ন্ত আচ্ছন্নের মতো বললে, “হ্যা মানিক, আমি ভুল দেখছি না তো? সত্যিই কি দরজাটা খুলে গেছে?”

দুই হাতে দুই চোখ কচলে আর-একবার ভালো করে দেখে মানিক বললে, "দরজা তো খোলাই রয়েছে দেখছি!"

- "কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি, দরজা ছিল বাইরে থেকে বন্ধ!"

বীরেন বললে, "না, বন্ধ ছিল না! আমি একবার টানতেই খুলে গেল!"

- "আর আমি একবার-দু-বার নয়, প্রাণপণে টেনে দেখেছি বার বার!"

মানিক বললে, "তাহলে একটু আগে তুমি যা বলেছিলে-এ হচ্ছে সে অঘটন ঘটন-পটীয়সী নিয়তির লীলা!"

- "না মানিক, কেউ বাইরে থেকে দরজাটা আবার খুলে দিয়েছে!"

- "কে খুলে দেবে? সুন্দরবাবু? কিন্তু সুন্দরবাবু কি আমাদের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর রসিকতা করবেন?"

- "আমার বিশ্বাস হয় না। দ্যাখো তো, বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না।"

মানিক বাইরে ছুটে গেল এবং তারপর চেঁচিয়ে বললে, "এখানে কেউ নেই। কেবল একটা কৌতূহলী তক্ষক খবরদারি করবার জন্যে ইঁদারার গা বেয়ে নেমে এসেছিল, আমাকে দেখে আবার উপর দিকে চম্পট দিলে!"

জয়ন্ত বেকুবের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "মানিক, সত্য-সত্যই একটা কোনো অঘটন ঘটেছে, কিন্তু সেটা যে কী আমি বুঝতে পারছি না!"

- "হয়তো সুন্দরবাবু এ অদ্ভুত সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। উপরে চলো।"

- "তাই চলো। রত্নকুঠি তো রত্নহীন, এখানে আর থেকেই বা লাভ কী?"

পাতালের অন্ধকার উদর ছেড়ে তারা এসে উঠল পৃথিবীর উপরে রাতের অন্ধকারের কোলে। সর্বাঙ্গে নিবিড় কালিমা মেখে জঙ্গলের বড়ো বড়ো গাছগুলো কী যেন নৈশ রহস্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কানাকানি করছে মর্মরভাষায়। থেকে থেকে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস এবং সঙ্গে সঙ্গে কূলে কূলে লিখে চলেছে অদূরবর্তিনী গঙ্গা তার মুখর তরঙ্গকাহিনি।

জয়ন্ত ডাকলে, "সুন্দরবাবু, সুন্দরবাবু! অন্ধকারে কোথায় গা ঢেকে পাহারা দিচ্ছেন?"

কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না।

মানিক বললে, "সুন্দরবাবু ঘুমিয়ে পড়েননি তো?"

জয়ন্ত বললে, "সেটা সম্ভব নয়। আমার মন আবার বলছে, একটা কোনো অঘটন ঘটেছেই!"

- "কী অঘটন?"

- "খোলা দরজা আপনি বন্ধ হয়, বন্ধ দরজা আপনি খুলে যায়, সুন্দরবাবু পাহারা না দিয়ে অদৃশ্য হয়ে থাকেন, এ সবই তো অঘটন! মানিক, তুমি একদিকে যাও, বীরেনবাবু, আপনি আর একদিকে যান, আর আমি যাই এই দিকে। দেখা যাক সুন্দরবাবুকে খুঁজে পাই কি না!"

মাঠের ও নদীর মধ্যবর্তী এই জঙ্গুলে জায়গাটায় রাত-আঁধারে লোকজন পদার্পণ করে না। জমি এবড়ো-খেবড়ো এবং খানা-ডোবায় দুর্গম। সহজে সুন্দরবাবুর পাত্তা পাওয়া যাবে বলে কেউ মনে ভাবেনি। কিন্তু তাদের সৌভাগ্যক্রমে একটুখানি অগ্রসর হয়েই সফল হল খোঁজাখুঁজি।

একটা ঝোপ দুলছে ঘনঘন। যেন কোনো জন্তু তার মধ্যে ঢুকে ছটফট করছে। সেই দিকে আকৃষ্ট হল মানিকের দৃষ্টি।

ঝোপের খানিকটা এক হাতে সরিয়ে আর এক হাতে তার মধ্যে আলো ফেলে মানিক সচমকে দেখলে, সেখানে ভূশয্যাশায়ী সুন্দরবাবু একসঙ্গে রজ্জুবদ্ধ পদযুগল ছুড়ছেন আর ছুড়ছেন! কেবল পা নয়, তাঁর বাহুযুগলও দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা এবং মুখ ও চোখের উপরে রয়েছে কাপড়ের বন্ধনী!

সুন্দরবাবুকে তাড়াতাড়ি বন্ধনমুক্ত করতে করতে মানিক ফুকরে উঠল, "জয়ন্ত, জয়ন্ত! সুন্দরবাবুকে পেয়েছি!"

সুন্দরবাবুর বিপুল ভুঁড়ি ফুলতে ও চুপসে যেতে লাগল স্যাঁকরার হাপরের মতো। বেশ কিছুক্ষণ নির্বাকভাবে হাঁপিয়ে নিয়ে তিনি সর্বপ্রথমে উচ্চারণ করলেন তার সেই চিরপ্রিয় শব্দ-"হুম!"

এতক্ষণে সুন্দরবাবু বাকশক্তি পেয়েছেন বুঝে জয়ন্ত শুধোলে, "আপনার এ দশা করলে কে?"

- "চোখে দেখিনি, তবে পরে কানে শুনে আন্দাজ করেছি।"

- "কিছুই বুঝলুম না।"

- "এখন বেশি বুঝিয়ে বলবার শক্তি নেই। তবে আসল কথাগুলো শর্টে বলতে পারি। তোমরা ইঁদারায় নেমে গেলে। আমি ঠায় বসে বসে পাহারা দিতে লাগলুম। কোথাও কারুর সাড়া পর্যন্ত নেই, অথচ আচমকা পশ্চাদভাগ থেকে আমার কানের ঠিক পিছন কে এসে বেমক্কা মুষ্টিপ্রহার করলে- মুষ্টিযোদ্ধারা যাকে বলে 'র‍্যাবিট পাঞ্চ'। এরকম ঘুসি মানুষকে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান করে দেয়-আমিও একেবারে বেহুঁশ! জ্ঞান হলে পর দেখি আমার এই অবস্থা! আমার চোখ বন্ধ, মুখ বন্ধ, আমি চলচ্ছক্তিহীন! কেবল কান খোলা ছিল বলে শুনতে পাচ্ছিলুম। শুনলুম অনেকগুলো পায়ের শব্দ। শুনলুম, কে বললে-"বড়োবাবু, লোহার দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছি।" তারপর বোধহয় বড়োবাবুই বললে-"দড়ির সিঁড়িটা টেনে তুলে রেখে দে!" আমাকেও কারা হিড়হিড় করে টেনে এই ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে রাখলে। তারপর বোধকরি সেই বড়োবাবুই বললে-"চল এইবারে! আর কোনো খলিফা আমাদের পিছনে জ্বালাতে আসবে না, আমরা নিশ্চিন্ত!" তারপর পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না। সব নিঝুম।" সুন্দরবাবু থামলেন। আবার হাঁপাতে লাগলেন।

- "তারপর আর কিছু বলবার নেই?"

- "নেই মানে? আলবত আছে! তারপরেই তো আসল বলবার কথা। কিন্তু একটু রও ভাই! আর একটু না হাঁপিয়ে জুত করে বলতে পারছি না-আমাতে কি আর আমি আছি দাদা?"

মিনিটখানেক আরও খানিকটা হাঁপিয়ে নিয়ে ও আরও খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে সুন্দরবাবু বললে, "হ্যাঁ, তারপর কী হল শোনো। খানিকক্ষণ ঝিঁঝিপোকাগুলোর একটানা গান ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। তারপর আশপাশের ঝিঁঝিপোকাগুলো আচমকা গান বন্ধ করে দিলে। আবার একজন মানুষের পায়ের শব্দ আমার পাশেই এসে থামল। আমি তো 'নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু'র উপরেও আরও বেশি আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে ভাবতে লাগলুম-এই রে, সেরেছে! এবারে বুঝি আমার প্রাণ নিয়েই টানাটানি করতে এল! তারপরেই শুনি-না, সে সব নয়, এ আবার নতুন ব্যাপার, যাকে বলে কল্পনাতীত! কে একজন আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে-"সুন্দরবাবু, ভালো করে শুনে রাখুন! আমি আবার দড়ির সিঁড়িটা ইঁদারার ভেতরে ঝুলিয়ে রেখেছি আর লোহার কবাটও খুলে দিয়েছি। আপনার কোনো ভয় নেই, জয়ন্তবাবুরা এখনই

এসে আপনাকে উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। তাদের বলবেন, প্রতাপ চৌধুরি তার দলবল নিয়ে বীরেনবাবুদের সাবেক বাড়ির দিকে গিয়েছে।" তারপর আবার পায়ের শব্দ, আবার সব চুপচাপ, আবার শুরু হল ঝঞ্জাটে ঝিঁঝিদের ঝাঁজরা গলায় ঝিমিঝিমি চিৎকার! সেই একঘেয়ে ঝিঁঝিঝিঁঝি আওয়াজ শুনতে শুনতে আমার সর্বাঙ্গ যেন ঝিন ঝিন আর মাথাটাও ঝিম ঝিম করতে লাগল। কিন্তু সেই অবস্থাতেই আমি আন্দাজ করতে পারলুম, দুরাত্মারা তোমাদের বন্দী করে দড়ির সিঁড়ি উপরে তুলে নিয়েছিল। তার কতক্ষণ পরে শুনলুম, তোমাদের ডাকাডাকি! আমি তো ব্রাদার, পড়ে গেলুম মহা ফাঁপরে।-কী করে তোমাদের জানাই যে আমার পক্ষে এখন সাড়া বা দেখা দেওয়া দুইই অসম্ভব! কিন্তু হাজার হোক আমি হচ্ছি গিয়ে প্রাচীন সৈনিক, ঝাঁ করে বুদ্ধি খুলে গেল! বুঝে ফেললুম, আমি চলতে না পারলেও বাঁধা পা দুটো ছুড়ে ছুড়ে অনায়াসেই ঝোপ নেড়ে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি! তারপর আর কী-হুম!"

সুন্দরবাবুর শেষ কথাগুলো জয়ন্ত যেন শুনছিল না, সে হঠাৎ চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল।

মানিক বললে, "জয়ন্ত, সব শেষে যে লোকটা সুন্দরবাবুর কাছে এসেছিল, সে নিশ্চয়ই সেই সন্ন্যাসী! কে সে জয়ন্ত, তাকে আমরা চিনি না, সে কিন্তু আমাদের সকলকেই চেনে, আর তার দৌলতেই আজ আমরা রসাতলের কারাগার থেকে ছাড়ান পেয়েছি!"

জয়ন্ত হঠাৎ একলাফে দাড়িয়ে উঠে সানন্দে চেঁচিয়ে বললে, "আবার তার অনুগ্রহে আজই প্রতাপ চৌধুরি সদলবলে ধরা পড়তে পারে!"

মানিক বললে, "বুঝেছি তোমার মনের কথা! তুমি এখনই বীরেনবাবুর বাড়ির দিকে ধাওয়া করতে চাও?"

- "নিশ্চয়ই! এ সুযোগ কে ছাড়ে?"

- "কিন্তু দুটো মুশকিল আছে। প্রথমত সেখানে পায়ে হেঁটে গিয়ে পৌঁছতে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে। ততক্ষণ কি তারা থাকবে?"

- "আর দ্বিতীয় মুশকিল?"

- "দলে তারা ভারী।"

- "মাভৈঃ! উঠুন সুন্দরবাবু! স্থানীয় পুলিশের থানার দিকে দ্রুত পদচালনা করুন। আপনি সম্প্রতি অবসর নিলেও বাংলা দেশের পুলিশ বিভাগে সুপরিচিত ব্যক্তি। খবর দিন, বিখ্যাত ডাকাত, হত্যাকারী আর ফেরারি আসামি প্রতাপ চৌধুরির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করুন। প্রতাপকে ধরবার জন্যে সরকার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এই মস্ত সুখবরটা পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পুলিশের তৎপরতা তিনগুণ বেড়ে উঠবে। একদল বন্দুকধারী সেপাই চাই! যেমন করে হোক, সকলকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে দু-তিন খানা মোটরগাড়িও দরকার!"

মানিক বললে, "এ সব আয়োজন করতে করতেও রাত পুইয়ে যেতে পারে।"

- "যাক। প্রতাপ চৌধুরি আজ বীরেনবাবুর বাড়িতেই রাত কাটাবে বলে মনে হয়। তাদের বিশ্বাস আমরা এখনও বন্দি, তারা নিরাপদ।"

।। একাদশ অধ্যায় ।।

প্রতাপ চৌধুরির সাগরেদ

সে হচ্ছে রাত্রি ও দিবসের মিলনলগ্ন। আকাশ নিবিয়ে দিচ্ছিল তারার বাতি, বিদায়ী আঁধার আসর ছেড়ে সরে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে এবং উদয়াচলে চলছিল তখন দীপ্তোজ্জল রঙের খেলার মোহনীয় আয়োজন! বাতাসে নূতন দিনের ঠান্ডা ছোঁয়া এবং বিহঙ্গরা রচনা করেছিল আলোকোৎসবের বন্দনাসংগীত। চিরদিনই আসে এই অন্ধকারের পর এই আলোর পালা, কিন্তু কখনও একঘেয়ে মনে হয় না এর তাজা মাধুর্যটুকু।

কিন্তু মাধুর্যের মাঝখানেও, এই সৌন্দর্যের কাব্যলোকেও মানুষ করে ছন্দভঙ্গ। সেই সম্ভাবনাই দেখা দিয়েছে আজ বীরেনবাবুর বসতবাড়ির চারিপার্শ্বে। সেখানে কোনো রক্তাক্ত নাট্যাভিনয়ের মহলা চলছে।

পাছে অপরাধীরা সাড়া পায়, সেই ভয়ে ঘটনাস্থল থেকে খানিক তফাতে মোটর থামিয়ে পুলিশের লোকরা চুপিচুপি গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অধিকাংশই তখনও শয্যার আশ্রয় ছাড়েনি। মাত্র কয়েকজন বয়স্ক লোক সবে বাড়ির

বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে এবং গৃহস্থদের কয়েকজন বউ-ঝি কলসি কাঁখে নিয়ে চলেছে এ-বাড়ির ও-বাড়ির পুকুরঘাটে।

হঠাৎ সকলে সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখলে, পুলিশবাহিনী এসে বাগচি-বাড়ির চারিদিক ঘিরে ফেললে। গ্রামের পুরুষরা বিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল, মেয়েদের আর জলকে যাওয়া হল না, শূন্য কলস নিয়ে ভীত-চকিত চক্ষে যে যার বাড়ির দিকে ফিরে চলল দ্রুতচরণে।

বাগচিদের অর্থাৎ বীরেনবাবুদের বাড়িখানা ছিল একটা ফর্দা জায়গার মাঝখানে। সেকেলে তিনমহলা বাড়ি। বাড়ি ঘিরে আগে ছিল যে বাগান, তা এখন পরিণত হয়েছে ছোটোখাটো একটি মাঠে। বাড়ির সীমানা নির্দেশের জন্যে বেড়া দেওয়া আছে বটে, কিন্তু ফটকের বাধা নেই, গ্রামের লোকজনরাও অনায়াসে সীমানার ভিতরে এসে মস্ত পুকুরটার জল ব্যবহার করে।

সুন্দরবাবু, মানিক ও বীরেনকে নিয়ে জয়ন্ত আত্মগোপন করে পিছন দিকে অবস্থান করতে লাগল, থানার দারোগাবাবু কতক লোক নিয়ে বাড়ির সদরের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বাকি লোকদের মোতায়েন রাখলেন চারিদিকে পাহারা দেবার জন্যে।

নিরাপদ ব্যবধানে থেকেও বাড়ির যতটা কাছে যাওয়া যায় ততটা কাছে গিয়ে দারোগাবাবু গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন, "বাড়ির ভেতরে কে আছে? বাইরে বেরিয়ে এসো।"

এতক্ষণ দোতলার একটা জানালায় জেগে ছিল একখানা মুখ। দূর থেকে সে লক্ষ করছিল পুলিশের কাণ্ডকারখানা। কিন্তু দারোগাবাবুর নির্দেশবাণী শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই তার মুখখানা আর দেখা গেল না।

কয়েক মিনিট কাটল। সদর দরজাও খুলল না বা বাড়ির ভিতর থেকেও এল না কোনো সাড়াশব্দ।

দারোগাবাবু আবার হাঁকলেন, "দরজা খোলো। নইলে আমরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকব।"

তখনও কেউ সাড়া দিলে না।

মিনিট-দুয়েক অপেক্ষা করে দারোগাবাবু চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন, "ভাঙো তবে দরজা। যে বাধা দেবে তাকেই গুলি করে কুকুরের মতো মেরে ফেলবে।"

বাড়ির ভিতর থেকে কে বললে, "দরজা ভাঙতে হবে না। আমরা বাধা দেব না, আত্মসমর্পণ করব।"

- "উত্তম! বেরিয়ে এসো একে একে।"

দরজা খুলে গেল। পরে পরে নয়জন লোক বাইরে এসে দাঁড়াল-প্রত্যেককে দেখলেই দুর্দান্ত ও দুশমন বলে চিনতে দেরি হয় না। প্রত্যেকের হাতে পরিয়ে দেওয়া হল লোহার হাতকড়া। তখন প্রত্যেকেরই জামাকাপড়ের ভিতর থেকে বেরুল কোনো-না-কোনো মারাত্মক অস্ত্র।

কুখ্যাত প্রতাপ চৌধুরি সদলবলে এমন শান্তশিষ্টের মতো ধরা দিল দেখে জয়ন্তের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না, সে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এসে বন্দিদের মুখের উপরে চোখ বুলিয়ে বলে উঠল, "কোথায় প্রতাপ চৌধুরি? তোমরা কেউ প্রতাপ চৌধুরি নও!"

বন্দিদের একজন হেসে বললে, "আমরা কেন প্রতাপ চৌধুরি হতে যাব? বাপ-মা আমাদের অন্য নাম রেখেছে!"

দারোগাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "চোপরাও বদমাশ! আবার রসিকতা হচ্ছে? বল কোথায় প্রতাপ চৌধুরি?"

- "জানি না। প্রতাপ চৌধুরি বলে কারুকে আমরা চিনি না।"

জয়ন্ত বললে, "দারোগাবাবু, আমার সঙ্গে কিছু লোক দিন, বাড়ির ভেতরটা খুঁজে দেখব।"

তন্ন তন্ন করে তল্লাশের পরেও প্রতাপ চৌধুরিকে পাওয়া গেল না।

দেখা গেল, খিড়কির দরজাটা খোলা। সন্দেহজনক! খিড়কি খোলা কেন? ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত বাড়ির বাইরে গিয়ে দীড়াল। দেখলে সেখানটা গাছপালায় আচ্ছন্ন। অল্প দূরেই পুকুরের একটা ঘাট।

জয়ন্ত বললে, "দ্যাখো মানিক, প্রথম ভোরের আধা-অন্ধকারে কেউ যদি এই ছায়াঢাকা পথ দিয়ে পুকুরঘাটে যায়, তাহলে সহজে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।"

মানিক জিজ্ঞাসু চোখে বললে, "কী বলতে চাও তুমি?"

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে ঘাটের দিকে অগ্রসর হল। এদিকে-ওদিকে উকিঝুঁকি মারতে লাগল।

একজন আধবুড়ো পাহারাওয়ালা খানিক দূরে পাহারায় নিযুক্ত ছিল।

তার কাছে গিয়ে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "একটু আগে কোনো লোককে দেখেছ?"

- "কোন লোক? পুরুষমানুষ? না।"

- "তবে কি এখানে কোনো স্ত্রীলোক ছিল?"



- "আজ্ঞে হ্যাঁ। গায়ের কোনো স্ত্রীলোক। মেটে কলসিতে জল নিতে এসেছিল- এখানে আসতে আসতে এমন অনেক মেয়েকেই তো দেখলুম!"

- "তারপর?"

- "তারপর পুলিশ দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পালিয়ে গেল!"

- "ঘোমটায় মুখ ঢেকে?"

- "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

- "কোন দিকে গেল?"

বাড়ির পিছন দিকের একটা পায়ে চলা পথ দেখিয়ে দিয়ে সে বললে, "ওইদিকে।"

- "কেন তুমি তাকে ছেড়ে দিলে?"

- "সে কী বাবু? আমরা এই বাড়ির ভিতরকার দুশমনদের ধরতে এসেছি, গাঁয়ের ভদ্দরলোকের মেয়ে ধরব কেন? সে তো বাড়ির ভেতরেও ছিল না।"

- "ঠিক দেখেছ?"

- "ঠিক দেখেছি। মেয়েমানুষটি কাঁকালে কলসি নিয়ে নীচে থেকে উঠেছিল পুকুরের ঘাটের উপরে।"

জয়ন্ত ফিরে বললে, "বীরেনবাবু, এই পায়ে-চলা পথটা কি গাঁয়ের দিকে গিয়েছে?"

বীরেন বললে, "না, গঙ্গার দিকে। ওই বাঁশঝাড়টার পরেই কলাবাগান, তার পরেই গঙ্গা-বাড়ির দোতলা থেকে দেখা যায়।"

জয়ন্ত বললে, "এখন আর পরিতাপ করে লাভ নেই। আমাদের এত চেষ্টা ব্যর্থ হল!"

সুন্দরবাবু চমকিত মুখে বললেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত, তুমি কি বলতে চাও সেই স্ত্রীলোকটা-"

- "স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ। প্রতাপ চৌধুরি নারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে পাহারাওয়ালার চোখে ধুলো দিয়েছে। সে পালাবার যথেষ্ট সময় পেয়েছে, এখন আর তাকে ধরবার উপায় নেই, তবু ওদিকটা একবার ঘুরে আসি চলুন!"

সবাই দ্রুত পদচালনা করলে, তারপর আচম্বিতে দেখলে এক কল্পনাতীত অদ্ভুত দৃশ্য!

।। দ্বাদশ অধ্যায় ।।

গুপ্ত নয়, ব্যক্ত ধন

বাঁশঝাড় আর কলাবাগানের মাঝখানে, পায়ে-চলা পথের পাশে খানিকটা জঙ্গুলে জমি। সেইখানে ভয়াবহ বীভৎসতায় সোনালি সকালের আনন্দকে বিষাক্ত করে তুলে মাটির উপরে পড়ে আছে রক্তধারার মধ্যে দুটো রক্তাক্ত নরদেহ-একটা মৃত ও আড়ষ্ট এবং আর একটা মৃতবৎ হলেও তখনও জীবিত। সকলে দাঁড়িয়ে পড়ল বিপুল বিস্ময়ে স্তম্ভিতের মতো।

এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য তাদের মুখের কথা কেড়ে নিলে কিছুক্ষণ পর্যন্ত। তারপর সর্বাগ্রে নিজেকে সামলে নিয়ে মৌন ভঙ্গ করলে জয়ন্ত। মৃতদেহটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে করে সে বললে, "দ্যাখো মানিক, পুরুষদেহে নারীর শাড়ি! ওকে চিনতে পারছ?"

সুন্দরবাবু চমৎকৃত মুখে বলে উঠলেন, "আরে হুম! ওই তো ফেরারি প্রতাপ চৌধুরি! ওর বুকে বেঁধা একখানা ছোরা, ওকে মারলে কে?"

- "আমি!"

যে বললে তার মাথায় জটা, মুখে দাড়ি-গোঁফ। অঙ্গে গৈরিক বস্ত্র। চিত হয়ে শুয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, "প্রতাপ চৌধুরিকে আমিই বধ করেছি। আমাকে চিনতে পারেন জয়ন্তবাবু?"

- "না। কে আপনি?"

- "ছদ্মবেশ না থাকলে চিনতে পারতেন। আমি আর বেশিক্ষণ বাঁচব না। তাই যাবার আগে পরিচয়টা দিয়ে যাই। আমার নাম মানিকচাঁদ।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কী আশ্চর্য! তুমি তো ছিলে প্রতাপ চৌধুরির প্রধান শাগরেদ, তারই সঙ্গে জেল ভেঙে পালিয়েছিলে!"

শ্বাস টানতে টানতে কষ্টের সঙ্গে মানিকচাঁদ বললে, “হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। কিন্তু তার পরের কথা আপনারা জানেন না। তার সঙ্গে জেল থেকে বেরিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, অসৎ পথে আর থাকব না, সৎ হব। প্রতাপ চৌধুরিকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলুম। সে হল আমার উপরে খড়্গহস্ত। আমি তার সমস্ত গুপ্তকথা জানতুম, সে আমাকে পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে দেবার জন্যে বারবার চেষ্টা করে। আত্মরক্ষার জন্যে আমি পালালুম, ছদ্মবেশ ধারণ করলুম। এমন হাঘরে যাযাবর-জীবন প্রাণ আমার অতিষ্ট করে তুললে। শেষটা তাকে পুলিশের হাতে আবার ধরিয়ে দিয়ে নিজে নিরাপদ হতে চাইলুম। তার অভিসন্ধি আমি জানতুম, নিজে আড়ালে থেকে তাকে চোখে চোখে রাখতে লাগলুম। আপনাদের কাছে তার খবর সরবরাহ করতুম। নিজের পরিচয় দিতে পারতুম না, কারণ আমিও ফেরারি আসামি।”

তার কথা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে এসে একেবারে বন্ধ হবার মতো হল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে আর একবার সামলে নিয়ে মানিকচাঁদ কোনোরকমে আবার বললে, “আজ সে পালাচ্ছিল, আমি তাকে বাধা দি। সে রিভলভার ছোড়ে, তখন নিজে চরম আঘাত পেয়েও তার বুকে ছোরা বসিয়ে আমি প্রতিশোধ নি।”

তার অন্তিমকাল উপস্থিত বুঝে বীরেন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে, “জগৎশেঠের রত্নকুঠির কথা আপনি কিছু জানেন?”

কিন্তু মানিকচাঁদ নির্বাক। তার দুই চক্ষু মুদে এল।

জয়ন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, “ভগবান মানিকচাঁদকে সৎপথের পথিক হবার সুযোগ দিলেন না বলে আমি দুঃখিত। আর বীরেনবাবু, আপনি ভাববেন না। এইবারে জগৎশেঠের রত্নকুঠি নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা করব। চলুন।”

বাড়িতে আবার ফিরে এসে জয়ন্ত বললে, “বীরেনবাবু, যে ঘর থেকে প্রতাপ চৌধুরি আপনার ঠাকুরদার গল্পের খাতার খানিকটা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, আমরা এখন সেই ঘরে গিয়েই বসতে চাই।”

বীরেন শ্রান্ত স্বরে বললে, “কী হবে আর সেই গুদামঘরে গিয়ে? আমার মন ভেঙে পড়েছে, আর পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে ভালো লাগছে না।”

সুন্দরবাবু সায় দিয়ে বললেন, “হ্যাঁ বীরেনবাবু, আমারও ওই মত। গুপ্তধন তো হয়ে দাঁড়াল অলীক দিল্লি কা লাড্ডু, আর মুখের কথায় হিল্লি-দিল্লি করে বেড়িয়ে লাভ

কী? প্রচুর কাদা ঘাঁটা হয়েছে, আমি এখন হস্ত-পদ বিস্তৃত করে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে চাই। হুম, চাই ঘুম!"

মানিক বললে, "আহা, যা বলেছেন! আমি এখনই একদৌড়ে বাজার গিয়ে আপনার নাসিকার জন্যে এক শিশি সর্ষপ তৈল কিনে আনব কি?"

সুন্দরবাবু খাপ্পা হয়ে মানিকের পৃষ্ঠদেশে মুষ্টিপ্রহার করতে উদ্যত হলেন, সতর্ক মানিক একলাফে গিয়ে পড়ল হাত কয়েক তফাতে!

কিন্তু জয়ন্ত গোঁ ছাড়লে না, শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে বীরেনকে উদ্দিষ্ট ঘরে গিয়ে হাজির হতে হল। তারপর অবহেলাভরে বললে, "এখন বলুন জয়ন্তবাবু, আপনার বক্তব্য কী?"

জয়ন্ত প্রথমে মুখে কিছু বললে না, স্তব্ধভাবে ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল।

এটা গুদামঘরই বটে, নানান রকম একালে অব্যবহার্য জিনিস বাড়ির এই ঘরখানায় কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে-গুরুভার ও মস্তবড়ো লোহার সিন্দুক, আগাগোড়া কাঠের আলমারি, ডেস্ক, ভারী ভারী বাসনকোসন এবং গৃহস্থালির ও গৃহসজ্জার কড়িখচিত দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি। শেষোক্ত জিনিসপত্রগুলিতে প্রাচীন বাংলা দেশের একটি নিজস্ব বিশেষত্ব ছিল। রকমারি কড়ির নামও ভিন্ন ভিন্ন-যেমন বিদন্তা, সিংহী, মৃগী ও হংসী প্রভৃতি। ঘরের কড়িকাঠ থেকে দোলনার মতো ঝুলছে একটি কড়ির আলনা। এ শ্রেণির জিনিস অধিকাংশ একেলে বাঙালি চোখেও দেখেনি।

একদিকে স্তূপীকৃত বা বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে অনেক প্রাচীন পুস্তক।

জয়ন্ত শুধোলে, "এই বইগুলোই বুঝি প্রতাপ চৌধুরিরা আলমারির ভেতর থেকে টেনে বার করেছিল?"

বীরেন বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বইগুলো ঠিক যেভাবে ফেলে গিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই পড়ে আছে।"

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মতো দুই-তিন খানা বই তুলে নিয়ে পাতার পর পাতা উলটে যেতে লাগল-মুখে তার চিন্তার লক্ষণ।

বীরেন অধীর স্বরে বললে, "জয়ন্তবাবু, আপনি কী আলোচনা করবেন বলেছিলেন না?"

জয়ন্ত বললে, “হ্যাঁ। বীরেনবাবু, আপনি বোধহয় মনে করেন যে, জগৎশেঠের গুপ্তধন হস্তগত করে প্রতাপ চৌধুরি শূন্যহস্তেই সদ্য সদ্য স্বর্গে বা নরকে যাত্রা করেছে?”

- “আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে করি।”

- “উঁহু, আমি তা মনে করি না।”

- “কেন করেন না?”

- “প্রমাণ দেখে।”

- “কি প্রমাণ?”



- "প্রথমত, গুপ্তধনের সন্ধানেই প্রথমে সে এই বাড়িতে এসেছিল। এখান থেকে সে চন্দ্রনাথবাবুর লেখা কাহিনি সংগ্রহ করে। সেই পাঁচ অংশে বিভক্ত লেখা কাহিনির তৃতীয় অংশ সে খাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায়, আমরা তা দেখতে পাইনি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস সেই তৃতীয় অংশেই চন্দ্রনাথবাবু বর্ণনা করেছিলেন, শেঠেদের বাগানবাড়িতে গিয়ে দ্বিতীয়বার ইঁদারায় নেমে কেমন করে তিনি গুপ্তধন দর্শন করেছিলেন। প্রতাপ চৌধুরিও তা পাঠ করে সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে দেখে যে, ইঁদারার মধ্যে গর্ভগৃহ আছে বটে, কিন্তু গুপ্তধন নেই।"

- "এটা আপনার যুক্তিহীন ধারণা।"

- "না, যুক্তিহীন নয়। প্রতাপ সেখানে গিয়ে গুপ্তধন পেলে পর আর আপনাকে আর আমাদের নিয়ে এত বেশি মাথা ঘামাতে আসত না, সানন্দে যাত্রা করত অজ্ঞাতবাসে।"

সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, "ঠিক, ঠিক! জয়ন্তের এ কথা জজে মানে!"

জয়ন্ত বললে, "তারপর দেখুন, সে কাল রাত্রে আবার এখানে এসেছিল। আজ যখন আমি প্রতাপের খোঁজে এই বাড়ির ঘরে ঘরে ঘুরছিলুম তখন দেখলুম যে, সে আর তার দলের লোকরা বাড়ির নানা ঘরে ঢুকে দেয়াল আর মেঝে খুঁড়েছে, লোহার সিন্দুক আর আলমারি প্রভৃতি ভেঙে তছনছ করে ফেলেছে। কেন তারা আবার এসেছিল? নিশ্চয়ই হাওয়া খেতে নয়! কী তারা খুঁজছিল? নিশ্চয়ই গুপ্তধন!"

বীরেন বললে, "আপনার মতকে আর অযৌক্তিক বলতে পারি না বটে, কিন্তু কোথায় সেই গুপ্তধন?"

- "গুপ্তধন হস্তগত করেছিলেন চন্দ্রনাথবাবু। কারবার পত্তন করবার সময়ে তার বেশ একটা মোটা অংশ খাটিয়ে বাকি অংশ তিনি লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন।"

- "কোথায়?"

- "বীরেনবাবু, আপনাদের কলকাতার বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন কে?"

- "আমার বাবা।"

- "আপনার ঠাকুরদাও কি সেখানে বাস করতেন?"

- "না।"

- "তিনি থাকতেন কোথায়?"

- "ব্যবসা-সূত্রে তাঁর কলকাতায় আসা-যাওয়া ছিল বটে, কিন্তু তিনি স্থায়ীভাবে বাস করতেন এই বাড়িতেই।"

- "তাহলে গুপ্তধনের বাকি অংশও আছে এই বাড়িতেই।"

- "আবার জিজ্ঞাসা করি, কোথায়? প্রতাপ খুঁজতে কোথাও বাকি রেখেছে কি?"

- "অন্ধের মতো খুঁজলে কিছুই পাওয়া যায় না।"

বীরেন এইবারে কিঞ্চিৎ শ্লেষজড়িত কণ্ঠে বললে, "তাহলে চক্ষুষ্মানের মতো খোঁজবার পদ্ধতি আপনিই দেখিয়ে দিন।"

জয়ন্ত অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "তাই দেখাব বলেই তো আমার এখানে আগমন।"

- "উত্তম। আমরা অপেক্ষা করছি।"

পকেট থেকে চন্দ্রনাথ লিখিত অসম্পূর্ণ কাহিনি সংবলিত খাতাখানা বার করে জয়ন্ত বললে, "বীরেনবাবু আপনার ঠাকুরদার রচনার পঞ্চমাংশে অর্থাৎ উপসংহারে কী আছে, ভোলেননি তো?"

- "আছে একটা অর্থহীন পদ্য বা ছড়া। কিন্তু মূল কাহিনির সঙ্গে তার কোনোই সম্পর্ক নেই।"

- "কে বললে সম্পর্ক নেই? কে বলে তা অর্থহীন? আপনি যা ভেবেছেন, প্রতাপ চৌধুরিও তাই ভেবেছিল, সেইজন্যেই আঁধার ভেদ করে ফুটে ওঠেনি আলোর রেখা। আমিও প্রথমে সেই পদ্যটিকে অগ্রাহ্য করেছিলুম, কিন্তু তার পরে মনে মনে তাকে নিয়ে যথেষ্ট ভেবেচিন্তে রীতিমতো অর্থের সন্ধান পেয়েছি!"

- "অর্থ না অনর্থ?"

- "না, অনর্থের মধ্যেই সত্য অর্থ। অর্থাৎ সেই পদ্যটিই ব্যক্ত করে দিয়েছে গুপ্তকে। অতঃপর আমি সে পদ্যের নির্দেশ মেনেই গুপ্তধন অন্বেষণ করব।"

সকলে অবাক হয়ে জয়ন্তের কাণ্ডকারখানা নিরীক্ষণ করতে লাগল বিস্মিতনেত্রে। অনুরূপ ক্ষেত্রে অনান্য অন্বেবকরা যা করে জয়ন্ত সে সব কিছুই করল না-অর্থাৎ সিন্দুক, আলমারি, দেরাজ, ডেস্ক বা বাক্স প্রভৃতি হাঁটকেও দেখলে না কিংবা ঘরের ছাদ, দেওয়াল কি মেঝে ঠুকেও দেখলে না কোনো জায়গা ফাঁপা বা নিরেট।

সে প্রথমে বিকীর্ণ ও স্তূপীকৃত পুস্তকগুলোর প্রত্যেকখানা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি হস্তচালনা করে গেল। তারপর বাসনকোসনগুলোও নেড়েচেড়ে দেখলে। তারপর কড়িকাঠ থেকে ঝুলন্ত কড়ির আলনার দিকে উচ্চমুখে, স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সুন্দরবাবু বললেন, "কী হে, আলনা দেখে একেবারে থ হয়ে গেলে যে!"

- "হ্যাঁ, কড়ির কারুকার্য সুন্দর আলনা, এখন আর দেখা যায় না। দণ্ডটা অন্তত চার হাত লম্বা আর এক বিঘত মোটা। দণ্ডের সমস্তটা পুরু লাল কাপড়ের আবরণ দিয়ে মোড়া আর উপরে বসানো অজস্র কড়ি। হংসী কড়ি, কারণ রং সাদা। সুন্দরবাবু সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর আগেও কলকাতায় আর মফস্‌সলে বাজারে কড়ি ফেলে জিনিস কেনা যেত, জানেন কি?"

- "না। ওই কি তোমার গুপ্তধন?"

- "উঁহু, ও হচ্ছে এখন বাজারে অচল ব্যক্ত ধন, সবাই দেখেও দেখতে চায় না। কিন্তু আলনাটা একবার নীচে নামালে হয় না?"

- "ধ্যেৎ, কেন?"

- "আরও ভালো করে সেকেলে কারিগরের কারিগুরি দেখব।"

- "তোমার যতোসব ছেলেমানুষি বায়না!"

কিন্তু জয়ন্ত যা ধরে, আর ছাড়ে না। কাজেই দড়ি ছিঁড়ে আলনাটাকে নীচে নামিয়ে আনতে হল।

জয়ন্ত মাটির উপরে বসে পড়ে দুই হাতে দণ্ডটাকে নাড়াচাড়া করে বললে, "এটা খুব ভারী, নিরেট বলে মনে হয়। সেকালের লোকরা ভারী ভারী আসবাব বানিয়ে ধনগর্ব প্রকাশ করত আর একালের আমরা হচ্ছি সুক্ষ্মতার ভক্ত। কড়িখচিত লাল আবরণীর তলায় কাঠ আছে বলেই মনে হয়। বীরেনবাবু, একখানা করাত বা ধারালো কাটারি এনে দিতে পারেন?"

- "কী আশ্চর্য, কী করবেন?"

- "আনলেই দেখতে পাবেন।"

করাত ও কাটারি দুইই পাওয়া গেল। জয়ন্ত বিনাবাক্যব্যয়ে কড়ির আলনার একটা প্রান্ত কেটে ফেলে বললে, “এটা দেখছি বিশেষভাবে তৈরি ফাঁপা জিনিস। তবুও এত ভারী কেন?”

সে ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে যা বাইরে টেনে আনলে তা হচ্ছে এমন চমকপ্রদ, অভাবিত জিনিস যে, সুন্দরবাবু, মানিক ও বীরেন বিস্ময়ে, আনন্দে ও উত্তেজনায় মুহ্যমান হয়ে স্তম্ভিতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইল মৌন শিলামূর্তির মত!

তার মধ্যে ছিল হীরক, নীলকান্তমণি, মরকত, পদ্মরাগ ও মুক্তা প্রভৃতি মহামূল্য রত্নরাজি! আরও কয়েকবার হস্তচালনার ফলে কক্ষতলে ছড়িয়ে পড়ল আরও কয়েক মুঠো মনিমুক্তা! মনে হয় দীপ্যমান ইন্দ্রধনুর খানিকটা খণ্ড খণ্ড হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ছড়িয়ে পড়ে সৌন্দর্যস্নান করছে প্রভাতি সূর্যকিরণে! শুক্ল, হরিৎ, নীল, পীত ও রক্ত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের যে কী অপরূপ সমুজ্জ্বল পুলকোচ্ছাস!

জয়ন্ত পরিতৃপ্তকণ্ঠে বললে, “বাইরে যা এনেছি তাইই যথেষ্টরও বেশি! ভিতরে রইল আরও কত লক্ষ টাকার ঐশ্বর্য, আমার কল্পনায় তা আসে না! এখন আপনাদের কিছু বলবার আছে?”

সুন্দরবাবু কেবল বললেন, “হুম!”

মানিক বললে, “জয়ন্তের কথা শুনে আর ভাবভঙ্গি দেখে আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম, আজ এখানে এমনি কোনো অপূর্ব আর আশ্চর্য ব্যাপারই দেখতে পাব!”

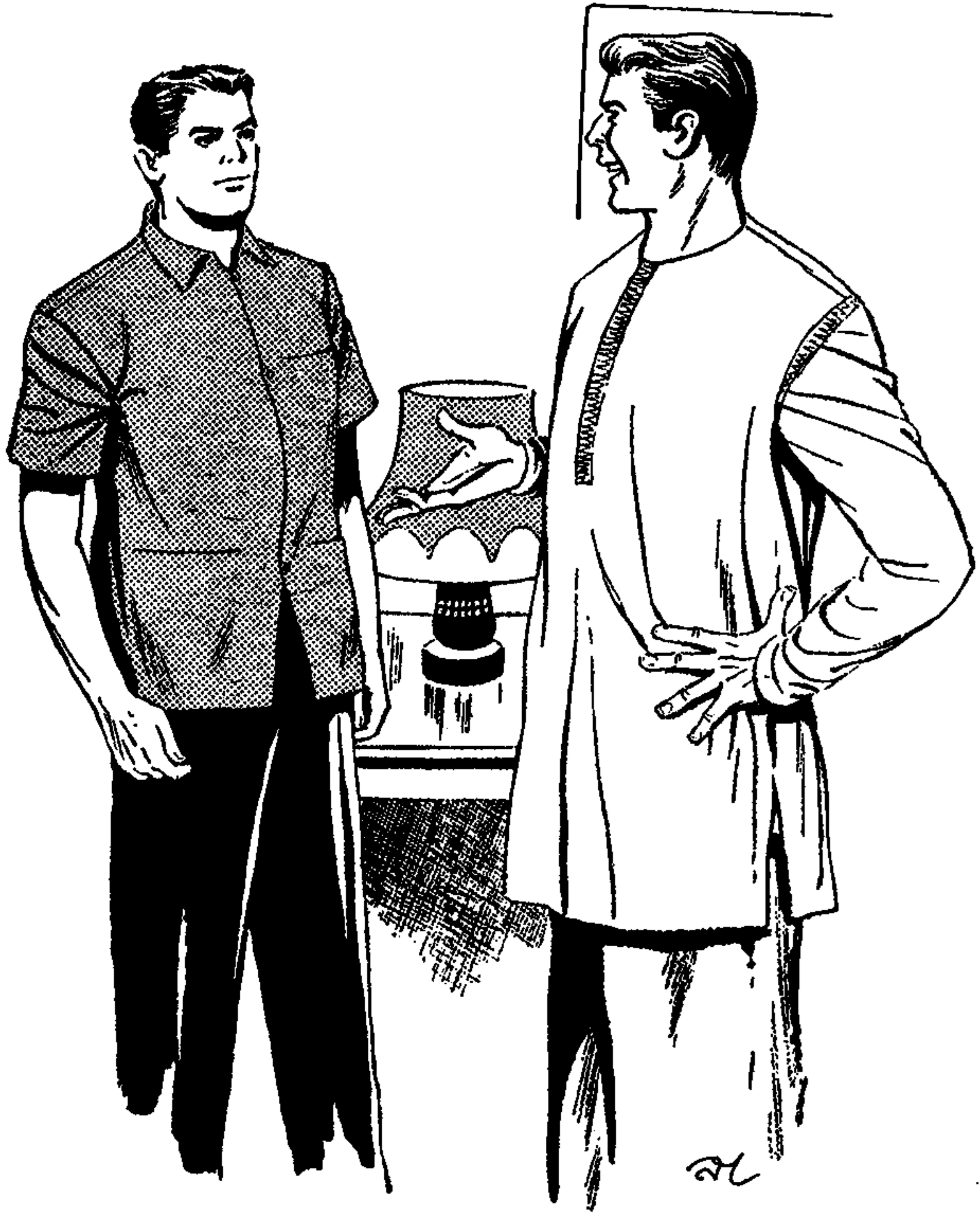
বীরেন অভিভূত ও উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠল, “জয়ন্তবাবু, জয়ন্তবাবু আপনি ঐন্দ্রজালিক! না না, আপনি তারও চেয়ে বিস্ময়কর!”

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, “অত্যুক্তি করবেন না বীরেনবাবু! আমি কেবল সহজবুদ্ধি ব্যবহার করতে পারি, আপনি যা পারেন না।”

বীরেন বললে, “এখনও বুঝতে পারছি না, আমার গলদ হয়েছে কোনখানে?”

- “কেন আপনি খাতার পদ্যটিকে অর্থহীন শব্দসমষ্টি বলে মনে করেছিলেন?”

বীরেন বললে, “তার অর্থ আপনিই আমাকে বুঝিয়ে দিন।”



জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, "অর্থ তো স্বতঃস্ফূর্ত! তার কতক অংশ আবার শুনুন:

'কিন্তু আমি ঠিক জানি ভাই!
গুপ্ত পথে রপ্ত সবাই,
সর্বজনের সামনে লুকোয় সহজ পথের পন্থী!'

তারপর স্পষ্ট কথা:

'মানসনয়ন যে খুলে চায়
সত্য মানিক সে-ই খুঁজে পায়,
মূর্খ শুধু রত্ন খোঁজে মস্ত লোহার সিন্দুকে!'

টীকা করব? চন্দ্রনাথবাবু বলছেন, গুপ্ত পথে চলতে সবাই অভ্যস্ত। যা গুপ্ত, তাকে আবিষ্কার করতে গেলে সকলেই আগে গোপনীয় স্থানই অন্বেষণ করে। যা চোখের সামনাসামনি থাকে, তাকে অবহেলা করা হয়। এইজন্যে যার সহজ বুদ্ধি আছে, সে সকলেরই চোখের সামনে অনায়াসে অবস্থান করেও কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তারই অন্বেষণ সফল ও তারই ভাগ্যে মণিমাণিক্য লাভ হয়, যার মানসনেত্র উন্মুক্ত। কিন্তু মূর্খেরা ভাবে, রত্নের সন্ধান পাওয়া যায় কেবল প্রকাণ্ড লৌহসিন্দুকেই! বীরেনবাবু, এই পদ্যই হয়েছে আমার চাবিকাঠি, আর তারই সাহায্যে খুলেছি আমি রহস্য-সিন্দুক! সুতরাং-"

সুন্দরবাবু বললেন, "সুতরাং-

জয়ন্তের কথা ফুরাল
বীরেনের ব্যথা জুড়াল!

হুম, আমিও বাবা পদ্য-টদ্য রচনা করতে পারি,-দেখছ তো!"



গোয়েন্দা জয়ন্ত-মানিক বনাম প্রতাপ চৌধুরি

জয়ন্ত আর মানিক দুই সমবয়সি বন্ধু। জয়ন্ত একুশ। মানিক উনিশের হবে। থাকেও একসঙ্গে। বাড়িতেই আছে বিরাট লাইব্রেরি আর ল্যাবরেটরি। কোনোদিন ভোর বেলা দোতলার ঘরে প্রবেশ করে শীতল বাতাস আর জয়ন্ত ধরে বাঁশিতে রামকেলির সুর। পরিচারক মধুর দিয়ে যাওয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মানিক হাতে তুলে নেয় সেদিনের সংবাদপত্রটি। এমন সময়ে সুপরিচিত বিপুল পদাঘাতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে যেন গোটা বাগবাজারই। দুনিয়া কাঁপিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন সুন্দরবাবু। পুলিশ অফিসার। ঔদরিক। মধুর হাতের চিকেন স্যান্ডউইচ তাঁর বড়ো প্রিয়। ফেলুদা কাহিনির জটায়ুর মতো এই থ্রি মাস্কেটিয়ার্স-এর কমিক রিলিফ কিন্তু তিনিই। মাঝে মাঝেই 'হুম' বলে ওঠা তাঁর অভ্যেস। আর আছেন প্রতাপ চৌধুরি। ভয়ানক ভিলেন। 'সোনার আনারস'-এর পরে 'জগৎশেঠের রত্নকুঠী' উপন্যাস দুটি জুড়ে চলতে থাকে তাঁর ভিলেনির কারনামা।

